বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথা

সুশীলকুমার দাশগুপ্ত

মালা পাবলিকেশনস্
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন,
কলিকাতা-৩৬

প্রকাশক :
শ্রীআশিস্ কুমার বর্ধন
মালা পাবলিকেশন্স্
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৩৬

প্রথম প্রকাশ :
জগদ্ধাত্রী পূজা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ : নভেম্বর, ১৯৫৩

প্রচ্ছদ : শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

পরিবেশক :
রূপম
৪, নিমাই বোস লেন, কলিকাতা-৬

ভিতরের চিত্র :
শ্রীমান সুপর্ণকুমার দাশগুপ্ত (বয়স-১০)

মুদ্রাকর :
শ্রীশান্তিনাথ পান
সুশীলা মুদ্রণ
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

সুরঞ্জনা, সন্দীপ, সুচেতনা, সুদীপ, ঝুমুর, সোনিয়া, সুপর্ণা, সঙ্গীতা, সঞ্চিতা, রনি, অনির্বাণ, অভিষেক ও মৌমিতাকে

পূর্বকথা

ত্য ও বেতালের জীবন প্রসঙ্গ

ফল লাভ করেছি যা খেলে মানুষ অ

সবচেয়ে যোগ্য মানুষ হিসাবে গণ্য করি, যিনি এই ফল খাওয়ার অধিকারী। কেননা, আপনার মতো সুযোগ্য রাজা অমর হলে প্রজাদের জীবনে চিরস্থায়ী মঙ্গল আসবে।'

রাজা ভর্তৃহরি হতবাক বিস্ময়ে ফলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ভেবে কূল পেলেন না, যে ফল তিনি রাণীকে দিয়েছিলেন সেটি এই মেয়েটির কাছে কিভাবে গেল। যাই হোক তিনি ফলটি গ্রহণ করে মেয়েটিকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন। এরপর তিনি বিষয়টি নিয়ে গোপনে অনুসন্ধান করে বুঝতে পারলেন যে ফলটি কিভাবে হাত বদলে বদলে সেই মেয়েটির কাছে পৌঁছায়। সংসারের মানুষের উপর এই ঘটনার পর তার ঘোর অবিশ্বাস জন্মায় এবং জীবনে সুখের অভাব বোধ ক'রে, সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঐহিক জগৎকে ভুলে তিনি ঈশ্বরের আরাধনায় কালাতিপাত করবেন বলে ঠিক করলেন। রাজা রাণীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি অমর ফলটি খেয়েছেন কিনা। রাণী মাথা নীচু করে নিশ্চুপ রইলেন। তখন রাজা সঙ্গে সঙ্গে সেই ফলটির খোসা ছাড়িয়ে তা নিজেই খেয়ে ফেললেন এবং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সন্ন্যাসীর পোশাক পরে গৃহত্যাগ করে গভীর বনে গিয়ে যোগসাধনা শুরু করলেন।

রাজহীন উজ্জয়িনীতে স্বভাবতই অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কঠোর তপস্যা করে তাঁর উপাস্য দেবতার কাছ থেকে একটি ফল উপহার পেয়েছিলেন। সেই ফলের এমনই মাহাত্ম্য যে সেটি খেলে মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে রেহাই পাওয়া যায় অর্থাৎ অমরত্ব লাভ করা যায়।

ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীকে প্রাণাপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন। ব্রাহ্মণ সেই ফল তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে দিয়ে বললেন যে দেবতা তুষ্ট হয়ে তাঁকে এই ফল দিয়েছেন, এই ফল যে খাবে সেই অমর-জীবন লাভ করবে। অমরত্ব লাভের জন্য ব্রাহ্মণীকে ফলটি খেতে বললেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণী সব শুনে সেই ফল স্পর্শ [illegible] দ্বার উন্মোচিত করেছিলেন দারিদ্র্যের সংসারে [illegible]।

বিষয় ভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি ও জীবনবোধের দিক দিয়ে অনুধাবন করলে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যময় এই উপাখ্যানগুলির আবেদন আজও সমান। তবে আখ্যানগুলিকে যুগমানসের কাছে উপভোগ্য করে তোলার জন্য ঘটনাবিন্যাসে কিছু পরিবর্তন সাধন করা, আখ্যানবস্তুতে কিছু সংযোজন করা বা আখ্যানবিষয়ের সংক্ষেপিতকরণ বা পরিমার্জন প্রয়োজন এবং সেই প্রাচীন আবহকে চিত্রিত করতে গেলে আধুনিক ভাষার সঙ্গে পুরোনো দিনের ভাষার সমন্বয় সাধন করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণেই এই

গ্রন্থ রচন

এই গ্রন্থ প্রকাশ করে শ্রীআশিসকুমার বর্ধন আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। আমার পুত্র শ্রীমান স্বপর্ণকুমার দাশগুপ্ত (১০) গ্রন্থটির ভিতরের চিত্র এঁকেছে।

উজ্জয়িনীর নগরপাল রাজমহিষীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাণী ফলটি তাঁকেই দিয়ে দিলেন। নীচু সমাজের একটি মেয়েকে গভীরভাবে ভালবাসতেন নগরপাল। তাকেই তিনি ফলটি দিয়ে সেটির গুণ বর্ণনা করলেন। মেয়েটি ভাবল, সমাজের নীচু তলার মানুষ সে, অমর হয়ে সমাজের কোনো উপকারে আসবে না, পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকা তার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। সে রাজা ভর্তৃহরিকেই ফলটি দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করল। রাজার কাছে গিয়ে ফলটিকে দেখিয়ে সে বলল, 'মহারাজ, আমি এমন এক ফল লাভ করেছি যা খেলে মানুষ অমর হয়, আমি আপনাকেই সবচেয়ে যোগ্য মানুষ হিসাবে গণ্য করি, যিনি এই ফল খাওয়ার অধিকারী। কেননা, আপনার মতো সুযোগ্য রাজা অমর হলে প্রজাদের জীবনে চিরস্থায়ী মঙ্গল আসবে।'

রাজা ভর্তৃহরি হতবাক বিস্ময়ে ফলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ভেবে কূল পেলেন না, যে ফল তিনি রাণীকে দিয়েছিলেন সেটি এই মেয়েটির কাছে কিভাবে গেল। যাই হোক তিনি ফলটি গ্রহণ করে মেয়েটিকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন। এরপর তিনি বিষয়টি নিয়ে গোপনে অনুসন্ধান করে বুঝতে পারলেন যে ফলটি কিভাবে হাত বদলে বদলে সেই মেয়েটির কাছে পৌঁছায়। সংসারের মানুষের উপর এই ঘটনার পর তার ঘোর অবিশ্বাস জন্মায় এবং জীবনে সুখের অভাব বোধ ক'রে, সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঐহিক জগৎকে ভুলে তিনি ঈশ্বরের আরাধনায় কালাতিপাত করবেন বলে ঠিক করলেন। রাজা রাণীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি অমর ফলটি খেয়েছেন কিনা। রাণী মাথা নীচু করে নিশ্চুপ রইলেন। তখন রাজা সঙ্গে সঙ্গে সেই ফলটির খোসা ছাড়িয়ে তা নিজেই খেয়ে ফেললেন এবং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সন্ন্যাসীর পোশাক পরে গৃহত্যাগ করে গভীর বনে গিয়ে যোগসাধনা শুরু করলেন।

রাজহীন উজ্জয়িনীতে স্বভাবতই অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দেবরাজ ইন্দ্র তখন এক যক্ষকে নিযুক্ত করলেন উজ্জয়িনীর শাসন-নির্বাহে। যক্ষ অত্যন্ত দায়িত্বসহকারে উজ্জয়িনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেশে-বিদেশে ক্রমশ রাষ্ট্র হয়ে গেল যে রাজা ভর্তৃহরি রাজ্যত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন। বিক্রমাদিত্যের কাছে এসব কথা অজানা নয়, তিনি তো দেশের মধ্যেই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সন্ন্যাসীর ধরাচূড়ো ছেড়ে আবার তিনি রাজবেশ পরে উজ্জয়িনীর রাজসভায় ফিরে চললেন সিংহাসনে বসতে। কিন্তু পথিমধ্যে যক্ষ তাঁকে বাধা দিল। বিক্রমাদিত্য তাঁর পরিচয় যক্ষকে দিয়ে তাঁর পথরোধ করতে নিষেধ করলেন। যক্ষ তখন বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'তুমি যদি সত্যই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, তাহলে আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় এস। বিক্রমাদিত্য যক্ষের এই আস্ফালন বন্ধ করার জন্য তাকে আক্রমণ করলেন প্রচণ্ড শক্তিতে। রাজা তাকে পরাজিত করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসলেন। সেই অবস্থায় যক্ষ সহজ-ভাবে বলল বিক্রমাদিত্যকে, 'আমি বুঝেছি, তুমি সত্যই প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা বিক্রমাদিত্য। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। তোমার প্রাণদান করছি আমি।' রাজা তা শুনে হেসে অস্থির, বললেন, 'তুই একটা অর্বাচীন, নাহলে এমন কথা বলবি কেন? তুই আমার প্রাণ দিবি! তোর প্রাণই এখন আমার হাতের মুঠোয়!' তখন যক্ষ গম্ভীর হয়ে বলল, 'মহারাজ আমি যা বলছি তা সত্য, মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমি তোমাকে সবকিছু বলব এবং সেইমত তুমি যদি চলতে পার তাহলে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই এবং তুমি দীর্ঘজীবি হয়ে রাজ্যশাসন করতে পারবে।' একথা শুনে রাজা শঙ্কিত হয়ে যক্ষের বুক থেকে উঠে পড়লেন। তখন যক্ষ স্বাভাবিক হয়ে রাজাকে এক ঘটনার বৃত্তান্ত খুলে বলল—

শুনুন মহারাজ, ভোগবতী নগরের রাজা চন্দ্রভানু একদিন শিকার করতে বেরিয়ে এক গভীর জঙ্গলে এসে পড়েছিলেন। সেখানে হঠাৎ

তার নজর পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্যের উপর। এক তপস্বী গাছের ডালে পা আঁকড়ে রেখে শরীর ও মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে চোখ বুজে নিথর নিস্পন্দ হয়ে তপস্যা করছিলেন। রাজা অনুসন্ধান করে জানলেন যে এই তপস্বী কখনও কারোর সঙ্গে কথা বলেন না, একই ভাবে তিনি গাছের ডালে পা জড়িয়ে শূন্যে শীর্ষাসনে থেকে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন গভীর বনের এই নিরালা নির্জন জায়গায়।

রাজা পরদিন রাজসভায় সভাসদ্‌দের উদ্দেশে বললেন যে তিনি এক বনের মধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বীর সন্ধান পেয়েছেন। বনের পথনির্দেশ দিয়ে তাঁদের তিনি বললেন, এই তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করে তাঁকে যে রাজসভায় নিয়ে আসতে পারবে তাকে তিনি লক্ষ মুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

রাজার এই কথা সারা দেশে প্রচারিত হল। এই অধর্মের কাজ করতে কেউই এগিয়ে এল না। শেষে এক অসৎ প্রকৃতির রমণী এসে রাজাকে বলল যে, সে সেই তপস্বীকে তার অরণ্যাশ্রম থেকে নিয়ে আসতে পারবে রাজসভায়, যদি রাজা তাকে অনুমতি দেন। রাজা তাকে সেকাজে উৎসাহিত করলেন।

রাজার পথনির্দেশ অনুযায়ী এই নারী জঙ্গলের মধ্যে সেই যোগীর তপস্যাস্থলে এসে পৌঁছাল। শীর্ণকায় অধ-শির যোগীকে ঝুলন্ত অবস্থায় একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতে দেখে সে বুঝল যে এঁর ধ্যান ভাঙ্গানো অত সহজ ব্যাপার হবে না। তখন সে তপস্বীর তপস্যাক্ষেত্রের কাছেই মনোরম উদ্যানসহ একটি অপরূপ কুটীর তৈরি করল। রমণীটি এই কুটীরেই বাস করতে লাগল। সে প্রতিদিন সকালে বিকেলে তপস্বীর নিথর ঠোঁট ফাঁক করে মোহনভোগের রস দাঁতে লাগিয়ে দিতে আরম্ভ করল। দাঁতে রস লাগামাত্রই তপস্বীর জিব লালায় চটচট করে ওঠে, জিব দিয়ে তপস্বী সে রস চুষে নিয়ে বেশ তৃপ্তি পেতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তপস্বীর লোভ জন্মে যায়। রমণীটি তা বুঝতে পেরে মোহনভোগ টুকরো টুকরো করে তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে

গলিয়ে দিতে আরম্ভ করতে লাগল। মোহনভোগের স্বাদ পেয়ে গোটা মোহনভোগই যেন সে খেতে পারে এমন ভাব দেখাল তপস্বী। তারপর থেকে সকালে বিকেলে তপস্বী প্রতীক্ষা করে থাকতেন কখন মোহনভোগ আসবে। একদিন মোহনভোগ খেতে খেতে পরম তৃপ্তিতে তিনি চোখ খুললেন। সামনেই এক রমণীকে দাঁড়ানো দেখলেন, তাকে দেখে একটু স্মিত হাসি হাসলেন তিনি।

উপর্যুপরি কিছুদিন মোহনভোগ খেয়ে তপস্বীর শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলে একদিন তিনি গাছ থেকে নেমে পড়ে ঐ রমণীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। তিনি রমণীটিকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় সে থাকে, কেনই বা সে একাকিনী এই নির্জন বনে এসেছে। রমণীটি উত্তর দিল, সে এক দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করে সে, সম্প্রতি তীর্থপর্যটনকালে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ভারতভূমিতে এসে এই বনাঞ্চলে সে আশ্রম তৈরী করেছে। এই আশ্রমেই সে এখন যোগসাধনা করে জানাল। তাঁর মতো তপস্বীর সেবা করতে পেরে সে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছে তাও বলল। তপস্বীটি সেই নারীর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালেন তার সেবাযত্ন লাভে, এবং তার মতো দিব্যকান্তি নারী-তপস্বীর সংস্পর্শে এসে প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হল তাঁর, তাও বললেন। তপস্বী রমণীটিকে তার আশ্রমে নিয়ে যেতে বললেন, তাঁকে। সে তপস্বীকে সাগ্রহে তার কুটীরে নিয়ে গিয়ে ঘটা করে তাঁর আদরযত্ন করল। সুস্বাদু সব ফলফলাড়ি মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয় দিয়ে তাঁকে পরিতুষ্ট করল। সেই নারীর মায়াজালে বদ্ধ হয়ে তপস্বী তাঁর সাধনা জলাঞ্জলি দিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করলেন তিনি। ঐ নারীর সঙ্গে অবশেষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহীজীবন যাপন করতে লাগলেন। ক্রমে তপস্বী একটি পুত্রের জনক হলেন। পুত্র-স্বামী নিয়ে কিছুদিন ঘর-সংসার করার পর সেই দুষ্টস্বভাবের স্ত্রীলোকটি স্বামীকে একদিন বললে যে. বিষয় বাসনা থেকে মনকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুদিনের জন্য তার তীর্থভ্রমণের অভিলাষ

হয়েছে। ভ্রষ্ট তপস্বী ছলনাকারী স্ত্রীর ফাঁদে পড়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে আর ছেলেকে নিয়ে প্রথমেই ভোগবতী নগরে এসে রাজসভায় রাজা চন্দ্রভানুর সঙ্গে দেখা করল। রাজা ঐ নারী ও তপস্বীর দিকে তীক্ষ্ণভাবে নজর দিয়ে বুঝতে পারলেন, তাঁর অভিপ্রেতমত স্ত্রালোকটি সেই তপস্বীকে বশ করে তাঁকে সাধনাচ্যুত করে নিয়ে এসেছে পুত্রসহ।

রাজা সভাসদ্‌দের কাছে ঘোষণা করলেন যে তাঁর অভিপ্রায় মত গভীর বনে কঠোর তপস্যাকারী সেই সাধুর তপোভঙ্গ করেছে এই রমণী এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিমত রমণীটিকে মূল্যবান পারিতোষিক দিয়ে খুশী করলেন। এইসব দেখে ও শুনে যোগীটির বোধোদয় হল: তিনি বুঝলেন যে তাঁর সাধনায় বাদ সাধতেই রাজা এই স্ত্রীলোকটিকে নিযুক্ত করেছিলেন। নিজের এই নৈতিক স্খলনের জন্য ও আত্মগ্লানিতে গভীর মর্মযন্ত্রণা হল তাঁর। ছেলেকে ও অবিশ্বাসী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, নীতিভ্রষ্ট রাজাকে অভিশাপ দিতে দিতে তিনি অন্য এক রাজ্যের উপকণ্ঠে এসে গভীর বনমধ্যে আবার তপস্যা শুরু করলেন দ্বিগুন মনোবল নিয়ে। তপস্যা শেষে তিনি রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে আপন সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত করলেন।

এই পর্যন্ত বলে যক্ষ রাজাকে বলল, 'আপনি, চন্দ্রভানু এবং ঐ যোগী একই নগরে, একই তিথি ও লগ্নে জন্মেছিলেন। রাজা চন্দ্রভানুকে আপনি নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন।' রাজা উত্তরে বললেন, 'তুমিই তো সেই চন্দ্রভানু।' 'হ্যাঁ ঠিকই'—যক্ষ বলল, 'আপনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করছেন, চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মে ভাগ্যবলে ভোগবতী নগরের অধিপতি হয়ে রাজত্ব করেছিলেন, আর ঐ যোগী কুমোরের বংশে জন্মে যোগবলে চন্দ্রভানুকে হত্যা করেছে এবং তাকে বেতাল করে শ্মশানের অদূরে এক শমী গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। সাবধান হোন রাজা এবারে আপনার পালা। আপনার প্রাণ-সংহার করলেই যোগীটির অষ্টসিদ্ধিলাভে কৃতকার্য

হবে। আপনি যদি এই যোগীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যান তাহলে বহুকাল নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতে পারবেন।'

যক্ষ একথা বলেই স্বস্থানে ফিরে গেল। নানা দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা নিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন বিক্রমাদিত্য। আবার তিনি রাজসিংহাসনে বসায় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল রাজ্যে।

কয়েকদিন পর শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী রাজসভায় এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে তাঁর হাতে একটি শ্রীফল দিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখে রাজার মনে কেমন যেন সন্দেহ হয়। যক্ষই কি এই সন্ন্যাসীর কথা তাঁকে বলেছিল মনে ভাবেন তিনি। যাই হোক, তিনি শ্রীফলটিকে রাজ-কোষাধ্যক্ষের হাতে দিয়ে বললেন যে এটি সযত্নে রেখে দিতে। সন্ন্যাসীটিকে দেখা গেল রোজই একবার করে রাজসভায় আসতে এবং প্রতিদিনই রাজাকে একটি করে শ্রীফল দিতে লাগলেন তিনি। রাজাও সেগুলিকে কোষাধ্যক্ষের হাতে জমা দিতে লাগলেন। একদিন এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হল রাজার। সন্ন্যাসী রোজকারমত সেদিনও রাজাকে যথারীতি আশীর্বাদ করে একটি শ্রীফল তাঁর হাতে যেই দিয়েছিলেন, অমনি ফলটি রাজার হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ফলটি মাটিতে পড়ে গিয়ে থেতলে গেলে তার ভিতরে একটি রত্ন দেখতে পেলেন রাজা। রাজা ও তাঁর সভাসদেরা সে রত্ন পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। কি কারণে রত্নগর্ভ ফল নিয়ে তাঁকে অনুগৃহীত করা হচ্ছে, জানতে চাইলেন রাজা সন্ন্যাসীর কাছে। শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, গুরু, রাজা জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকের কাছে শূন্য হাতে যাওয়া অনুচিত। সন্ন্যাসী রাজাকে আরও বললেন, শুধুমাত্র এই ফলটিতে নয়, প্রতিদিন যত ফল দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটিতে একটি করে রত্ন আছে।

রাজা সন্ন্যাসীকে বসিয়ে কোষাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আজ পর্যন্ত যত শ্রীফল তার কাছে রাখা আছে, প্রত্যেকটির ভিতরে একটি করে রত্ন রয়েছে। সেগুলিকে তিনি নিয়ে আসতে বললেন

কোষাধ্যক্ষকে। কোষাধ্যক্ষ সেই রত্নগুলিকে রাজার সামনে নিয়ে এলে তিনি নিজের মণিকারকে ডেকে সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করতে বললেন। মণিকার সেগুলি পরীক্ষা করে বলল যে অমূল্য রত্ন এসব, এক একটি রত্নের মূল্য ন্যূনপক্ষে এককোটি মুদ্রা তো হবেই।

এইসব অমূল্য রত্ন দেখে রাজা সন্ন্যাসীকে বললেন যে তিনি যেসব রত্ন তাঁকে দান করেছেন, তাঁর সাম্রাজ্যের বিনিময়েও এসব লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি কোথা থেকে এসব রত্ন পেলেন এবং কি উদ্দেশ্যেই বা তিনি এই রত্নরাজি তাঁকে দিলেন রাজা জানতে চাইলেন সন্ন্যাসীর কাছে। রাজা তাকে আরও বললেন যে তিনি তাঁকে এত রত্ন দিলেন অথচ একদিনের জন্যও তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন না, এমন কি জলও গ্রহণ করলেন না, এতে তিনি বেশ বিব্রত বোধ করছেন। সন্ন্যাসী তখন রাজাকে সঙ্গোপনে বললেন, গোদাবরী নদীর তীরে শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধির অভিপ্রায় রয়েছে তাঁর, অষ্টসিদ্ধি লাভে সংকল্প করেছেন তিনি। রাজাকে তিনি ঐ বছরেই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রে শ্মশানে আসতে বললেন; তিনি তাঁর মন্ত্রসিদ্ধির সহায়ক হিসাবে রাজাকেই উপযুক্ত বলে মনে করেন জানালেন।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যালগ্নে সন্ন্যাসী যোগসাধনায় বসলেন। রাজাও তখন কথামত শ্মশানে সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। রাজা দেখলেন সন্ন্যাসীর চারিদিকে ভূতপ্রেত, ডাকিনী-যোগিনী উন্মত্ত নৃত্য করে চলেছে। সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে দুই নর-কপাল হাতে নিয়ে নিবিষ্টমনে বাজনা বাজাচ্ছেন। এই ভৌতিক দৃশ্য দেখেও রাজা নির্ভয়ে সন্ন্যাসীকে করজোড়ে ভক্তি সহকারে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে সামনে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বলে তাকে বললেন, দুই ক্রোশ দূরে এক শমীবৃক্ষে বেতাল ঝুলে আছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। রাজা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে রওনা দিয়ে সেই শমীবৃক্ষের কাছে এসে দেখলেন সেটিও ভয়ঙ্কর জায়গা, সেখানেও ভূতপ্রেতরা নাচানাচি করছে, ডাকিনীরা উৎকট চিৎকার

করে নরমাংস খাচ্ছে। সেই শমীবৃক্ষের পাতাগুলো আগুনে ঝলসে যাচ্ছে লক্ষ্য করলেন তিনি। শমীবৃক্ষে ঝুলন্ত শবটিকে দেখেই তিনি বুঝলেন বেতাল এর মধ্যেই আশ্রয় করে আছে। তিনি দেখলেন শবটি গাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, শবটির মাথা নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে। তিনি তখন নির্ভয়ে গাছে উঠে শবের দড়ি কেটে দিলেন। শবটি নীচে পড়ে গিয়ে কান্নার রোল তুলে চারিদিক সরব করে তুলল। শবের এই বিস্ময়কর কান্না শুনে রাজা গাছ থেকে নেমেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার। তুমি কে? এইভাবে তোমাকে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল কেন? তুমি কাঁদছই বা কেন?' বিক্রমাদিত্যের কথার কোন উত্তর না দিয়ে শবটি আরও রহস্য সৃষ্টি করে খিলখিল করে হাসতে লাগল। রাজা শবটির বিচিত্র ভৌতিক আচরণ দেখে হত-বুদ্ধি হয়ে গেলেন। এই সুযোগে শবটি গাছে উঠে দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে আবার মাথা নীচে রেখে ঝুলে থাকল গাছের ডাল থেকে।

রাজা কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলেন শবটি আবার গাছ থেকে ঝুলে রয়েছে। তিনিও আবার গাছে উঠে দড়ি কেটে শবটিকে মাটিতে নামালেন। তাকে তিনি অত্যন্ত হার্দ্র্যস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি এরকম আচরণ করছেন। কিন্তু এবারও শবটি কোন উত্তর দিল না। তখন বিক্রমাদিত্যের বোধোদয় হয় যে এই শবেই অন্তরীণ রয়েছে বেতাল, তেলীর ঘরে জন্মে ভাগ্যগুণে যে রাজা হয়েছিল, যক্ষের বর্ণিত সেই রাজা চন্দ্রভানুই এই বেতাল। এই বোধও রাজার হল, যে কুম্ভকারের কথা যক্ষ বলেছিল, সাধন বলে যে সিদ্ধকাম যোগী হয়ে রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করেছিল, সেই হল এই সন্ন্যাসী।

বিক্রমাদিত্য এবারে সন্ন্যাসীর পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী বেতালকে কাঁধে তুলে সন্ন্যাসীর যোগস্থলের দিকে রওনা হলেন। সন্ন্যাসীর অভিপ্রায়মত বিক্রমাদিত্যকে সারাটা পথ মৌনাবলম্বন করে চলতে হবে। বেতালকে নিয়ে রাজা মাঝপথ পর্যন্ত এলে আকস্মিক

সচকিত হয়ে বেতাল রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে? আমাকে তুমি কোথায় কি কারণে নিয়ে যাচ্ছ?' রাজা উত্তর দিলেন, 'আমি বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল নামে এক যোগীর নির্দেশ অনুযায়ী আমি



তোমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছি।' বেতাল তা শুনে সমস্ত ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করলেন, রাজাকে অবশ্য তিনি কিছুই বুঝতে না

দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, মূঢ়, নির্বোধ, আর অলস প্রকৃতির লোকেরা কেবল নিদ্রায় আলস্যে ও ঝগড়া বিবাদে দিনাতিপাত করে, কিন্তু সৎ বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সদালাপ ও সদাচারণ, শাস্ত্রালোচনা ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে জীবননির্বাহ করেন। সুতরাং সমস্ত পথ মৌন না থেকে সৎ আলোচনা করাই শ্রেয় হবে আমাদের কাছে। মহারাজ, আমি বাকি পথটায় এক একটি করে কাহিনী বলে যাব। আর প্রতিটি কাহিনী শেষে আমি তা থেকে একটি করে প্রশ্ন করব। যদি তুমি প্রতিক্ষেত্রেই তার যথাযথ উত্তর দিতে পার, তাহলে আমি প্রতিবারই গাছে ফিরে যাব। তোমাকেও বারে বারে আমাকে গাছ থেকে নিয়ে আসতে হবে। আর যদি রাজা, আমার প্রশ্নোত্তর দিতে তুমি অপারগ হও, তাহলে জেনে রেখ, তোমার বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব।'

বেতালের কথায় রাজী না হওয়ার আর কোন উপায়ই থাকল না রাজার। তিনি বেতালকে কাঁধে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন শ্মশানে সন্ন্যাসীর আশ্রমের উদ্দেশে; বেতালও তাঁর প্রথম উপাখ্যান শুরু করল। একে একে পঁচিশটি উপাখ্যান শোনাল বেতাল রাজাকে। রাজা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেতালের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। এক একটি উপাখ্যান শেষে বিক্রমাদিত্যের কাছ থেকে নিজের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শমীবৃক্ষে উঠে গিয়ে তার ডাল থেকে ঝুলে পড়ে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য প্রতিবারই শমীবৃক্ষ থেকে বেতালকে কাঁধে তুলে আবার ধ্যানরত সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে শ্মশানের দিকে রওনা দেন। পঁচিশটি উপাখ্যান থেকে দেওয়া সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেল যখন বেতাল বিক্রমাদিত্যের কাছ থেকে, তখন বেতাল তাঁর কি অশেষ উপকার করল, বেতালের পঁচিশটি উপাখ্যান উপস্থাপন করার পর শেষে তা বলা হল।

প্রথম উপাখ্যান

বারাণসীর রাজা প্রতাপমুকুটের প্রিয়পুত্র বজ্রমুকুট একদিন তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের পথে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন। গহন জঙ্গলের ভিতরে এক দীঘির পাড়ে এসে পড়লেন তারা দুজনে। বক, চক্রবাক, চিল পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে মাছ শিকারে ; হাঁসের দল কেলি করে চলেছে জলে। দীঘির পাড় বরাবর সারিবদ্ধ নানা জাতীয় ফুল-ফল গাছ দীঘিটিকে ঘিরে সৃষ্টি করেছে এক রম্যশ্যাম পরিবেশ। ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া আর তার সঙ্গে ভেসে আসা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ এই স্নিগ্ধ ছায়াঘন পরিবেশকে আমোদিত করে তুলেছে। জঙ্গলের মধ্যে এমন একটি মনোরম জায়গা পেয়ে রাজকুমার আর তাঁর বন্ধু ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। ঘোড়াটিকে একটি বকুল গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে তাঁরা দুজনে দীঘিতে স্নান করে দীঘির অদূরেই মহাদেবের এক মন্দিরে পূজা দিলেন নিষ্ঠাসহকারে। মন্দির থেকে বেরিয়েই তাঁরা দেখলেন, সেখান থেকে অল্পদূরে অবস্থিত অপর একটি শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে

এক রাজকুমারী তাঁর সহচরীদের নিয়ে বিপরীত দিক দিয়ে তাঁদের দিকেই আসছেন। দুপক্ষেরই চলার গতি শ্লথ হয়ে গেল। যতই কাছাকাছি এল পথে তারা পরস্পরে, রাজকুমারীর সৌন্দর্যে মোহিত



হয়ে গেল রাজকুমার—যতক্ষণ পারা যায়, রাজকুমারীর দিকে অপলক তে চেয়ে থাকেন তিনি। রাজকুমারীও রাজকুমারকে আড়চোখে

দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁর সুদর্শন কান্তি দেখে। দুজনেই অল্পক্ষণ চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গেলেন। রাজকুমারী তাঁর মনের ভাব অব্যক্ত-ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে নিজের মাথার ওপরে রাখা পদ্মফুলটিকে ডান হাতে তুলে নিয়ে কানে ছুঁইয়ে সেটিকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ের তলায় ফেলে দিলেন; পরক্ষণেই ফুলের ছেঁড়া পাপড়িগুলিকে হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে তুলে নিজের বুকের কাছে এনে রাজকুমারের দিকে মুহূর্ত-সময় সলজ্জ দৃষ্টিপাত করেই সহচরীদের সঙ্গে দ্রুত চলে গেলেন রাজকুমারের দৃষ্টি ছাড়িয়ে।

রাজকুমারী দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে রাজকুমার বজ্রমুকুট মন্ত্রী-পুত্রকে বললেন, রমণীটি কেন রাজকুমারীই হবে। রমণীটিকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই তার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে তাঁর একথা মন্ত্রী-পুত্রের কাছে অকপটে প্রকাশ করলেন তিনি। বন্ধুকে বললেন, ঐ রমণীকে তিনি বিবাহ করবেনই, ওকে ছাড়া তিনি জীবনে সুখী হতে পারবেন না।

বজ্রমুকুট রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছেড়ে বিভোর হয়ে কেবলই সেই রমণীরই কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে অস্থির অধীর হয়ে তিনি রাজকুমারীটির একটি প্রতিমূর্তি এঁকে সেই ছবিটির সামনে বসে প্রেয়সীর ধ্যানমূর্তির কল্পনায় প্রাণমন সঁপে দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে রইলেন দিনরাত। তার পিতা প্রতাপমুকুট তার এই অবস্থা দেখে তিরস্কার করলেন তাকে; কিন্তু তাতেও রাজ-কুমারের ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো।

মন্ত্রীপুত্রও এসে তাকে নানা উপদেশ দিয়ে তাঁর এই অহেতুক চিন্তাভাবনার জন্য ভৎসনা করলেন, কিন্তু রাজকুমার অবিচল, সেই রমণী ছাড়া তাঁর আর কোন চিন্তা নেই। তখন মন্ত্রীপুত্র বুঝলেন রাজকুমারকে এই অবস্থায় ভর্ৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। রাজকুমার তাঁকে বললেন, যে তাঁর জীবনের সুখদুঃখ মঙ্গলামঙ্গল এখন সবই সেই রাজকুমারীকে ঘিরে; তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলেই তার

জীবন স্বাভাবিক হবে, নচেৎ নয়। তিনি বন্ধুর কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে যদি তিনি রাজকুমারীকে পত্নীরূপে না পান কাছে, তাহলে নির্ঘাত জীবন বিসর্জন দেবেন। তা শুনে মন্ত্রীপুত্র বুঝলেন বিষয়টি বহুদূর গড়িয়েছে। এই অবস্থায় রাজকুমারকে সাহায্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তার। তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন রাজকুমারী কি তাঁর প্রতি কোন অনুরাগের ভাব দেখিয়েছিল। রাজকুমার তখন পদ্মফুল নিয়ে রমণীটি যে ইঙ্গিতবহ কাজ করেছিল তার কথা বললেন। মন্ত্রীপুত্র সেই সঙ্কেতের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেন। রাজকুমারকে বললেন তিনি, রাজকুমারীটির নামধাম কি তা জানতে পেরেছেন এই সঙ্কেতের মাধ্যমে। তিনি রাজকুমারকে কথা দিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই রাজকুমারীটির সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দেবেন। মনের জোর ছাড়া ধৈর্যহীনতায় ও ব্যাকুলতায় অভীষ্টসিদ্ধি হয় না, ধৈর্য ধারণ করলেই ঈপ্সিতবস্তু লাভ করা যায়— রাজকুমারকে মন্ত্রীপুত্র স্মরণ করিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে রাজকুমারের কৌতূহল চরম পর্যায়ে উঠেছে, বন্ধুর কাছ থেকে জানতে চাইলেন, রাজকুমারী যে সঙ্কেত করেছিলেন তার তাৎপর্য। মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারের কৌতূহল নিবারণ করে বললেন যে রাজকুমারী মাথা থেকে পদ্মফুল নামিয়ে কানে ছুঁয়েছিলেন, এর অর্থ তিনি কর্ণাটনগরের রাজকুমারী। দাঁত দিয়ে ফুলের পাপড়িগুলি ছিঁড়েছিলেন তিনি, এই সঙ্কেতের দ্বারা বলতে চেয়েছিলেন, তিনি দন্তবাট রাজার কন্যা। পায়ের তলায় পদ্মের পাপড়িগুলি ফেলে দিয়ে জানাতে চেয়েছিলেন যে তাঁর নাম পদ্মাবতী। বুকের কাছে ছেঁড়া পাপড়িগুলি তুলে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে রাজকুমার তাঁর হৃদয়েশ্বর।

মন্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে রাজকুমারীর সঙ্কেতের এই ব্যাখ্যা শুনে রাজকুমার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি বন্ধুকে প্রস্তাব দিলেন রাজকুমারীর উদ্দেশে তক্ষুনি রওনা দেওয়ার। বন্ধুও রাজী

হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুজনে সুসজ্জিত ও সশস্ত্র হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কর্ণাটনগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন! কর্ণাটনগরে এসে রাজবাটির কাছে দেখলেন, আপন গৃহদ্বারে এক বৃদ্ধা বসে আছেন। তাঁকে দেখেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাঁরা বললেন, 'দিদিমা আমরা ব্যবসায়ী লোক, বাণিজ্য করতে এসেছি এই নগরে; আমাদের মালপত্র পিছনে পিছনে আসছে। আমরা এখানে এখন বাসার খোঁজে ঘুরছি; যদি আমাদের জন্য এখানে কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।' বৃদ্ধা তাঁদের সম্ভ্রান্ত চেহারা ও পরিপাটি বেশভূষা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন তাঁদের, তাঁরা তাঁর বাড়িতেই স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র বৃদ্ধার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর বাড়ীতেই আশ্রয় নিলেন।

বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন তাঁরা, বৃদ্ধার এক পুত্র রাজপরিবারের কর্মচারী। তিনি নিজেও রাজ-পরিবারের নিমক খেয়েছেন, রাজকুমারী পদ্মাবতীর ধাত্রী ছিলেন তিনি, এখন বৃদ্ধ হয়েছেন বলে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তিনি ধাত্রীর কাজ ছেড়ে দিলেও রাজা এখনও তাঁর জীবনধারণের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। রাজকন্যা তাঁকে খুবই ভালবাসেন বলে তিনি রোজই একবার করে তাঁকে দেখতে যান বললেন। একথা শুনে দুজনেরই মনে খুব আনন্দ হল; রাজকুমারীর সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে বুঝলেন তাঁরা। রাজপুত্র বৃদ্ধাকে বললেন, পরদিন যখন তিনি রাজকন্যার কাছে যাবেন, তখন তাঁর মারফত একটি খবর রাজকন্যাকে দেবেন তিনি। বৃদ্ধা বললেন, যদি সেরকম জরুরী কিছু খবর থাকে তাহলে এই মুহূর্তেই তিনি রাজকন্যাকে তা জানিয়ে আসতে পারেন। রাজকুমার বৃদ্ধার মুখ থেকে এই কথা শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন, এখনই যদি সে খবর তাঁকে দিতে পারেন, তাহলে খুবই উপকার হবে তাঁর। তিনি রাজকন্যাকে এই

কথা বলতে বললেন যে গত শুক্লাপঞ্চমীতে জঙ্গলের ভিতর দীঘির পাড়ে যে রাজকুমারকে তিনি দেখেছিলেন, সে তাঁর সঙ্কেত অনুসারে এই নগরে এখন উপস্থিত হয়েছে।

বৃদ্ধা তখুনই লাঠি ভর দিয়ে প্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যার সামনে উপস্থিত হলেন। রাজকন্যা একাকী বসেছিলেন তাঁর নির্জন ঘরে। রাজকন্যা তাঁর পুরোনো ধাত্রীকে দেখেই তাঁকে সমাদরে বসিয়ে জানতে চাইলেন তাঁর শারীরিক কুশল। বৃদ্ধা তাঁকে বললেন, ভালই আছে সে। তারপর একটু থেমেই বৃদ্ধা বললেন, 'ছাখ মা, শিশু বয়স থেকেই তোমাকে আমি মানুষ করে এসেছি। এখন তুমি বিবাহযোগ্যা। আমার এখন একান্ত অভিলাষ যে তুমি এবারে সৎপাত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধ, তোমার বিবাহিত সুখী জীবন দেখে যেতে চাই আমি।' ভূমিকাটি সেরেই বৃদ্ধা এবার কাজের কথাটি পাড়লেন। বৃদ্ধা বললেন, 'গত শুক্লাপঞ্চমী'তে তুমি জঙ্গলের ভিতরে দীঘির পাড়ে যে রাজকুমারের মন চুরি করেছিলে, আমার গৃহে অতিথি হয়ে এসেছে সে। তোমাকে তিনি এই কথা বলতে বলেছেন যে, কমল-সঙ্কেত দ্বারা তুমি যা প্রকাশ করতে চেয়েছিলে, তাতেই সাড়া দিয়ে এসেছেন তিনি এই নগরে, তোমার পুরোনো এই ধাত্রীর গৃহেই প্রতীক্ষা করছেন তিনি। আমিও বলছি তোমাকে, এই রাজকুমার প্রকৃতই তোমার উপযুক্ত পাত্র। তুমি যেমন রূপবতী ও গুণবতী, সেও তেমনি রূপবান ও গুণবান, রাজযোটকই বটে।'

ধাত্রীর সব কথা শুনে রাজকুমারী উষ্মা প্রকাশ করে হাতে চন্দন লেপে ধাত্রীর দুই গালে দুটি চড় বসিয়ে দিলেন। হতবিহ্বল হয়ে গেলেন ধাত্রী। আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অন্তঃপুর থেকে বের করে দিলেন রাজকন্যা তাঁকে। অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে এলেন ধাত্রীটি রাজকুমারের কাছে। ধাত্রীর মুখ থেকে রাজকন্যার রূঢ় আচরণের কথা শুনে রাজকুমারের মুখ কালো হয়ে গেল গভীর বিষন্নতায়। একটুক্ষণ পর নিজেকে কিছুটা সামলিয়ে নিয়ে

বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে বললেন তিনি, 'আমার মনের আশা মনেই থেকে গেল। মনস্কাম পূরণের সব সম্ভাবনাই শেষ হয়ে গেল। না হলে, যদি অনুরাগের সঞ্চারই হত রাজকন্যার মনে, ধাত্রীকে তিরস্কার করে বিদায় করে দেবে কেন সে।' মন্ত্রীপুত্র শুনে বললেন, 'রাজকন্যার এই আচরণের মর্মার্থ বুঝতে না পেরে অযথা তুমি হতাশ্বাস হয়ে পড়ছ। চন্দনসিক্ত দশ আঙ্গুলের ছাপ এই ইঙ্গিতেই দেয় যে শুক্লপক্ষের আর দশদিন অবশিষ্ট আছে। আজ থেকে দশদিন পরে কৃষ্ণপক্ষে তোমার সঙ্গে রাজকন্যার সাক্ষাৎ হবে।'

শুক্লপক্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন ধাত্রী রাজকুমারীর কাছে গিয়ে রাজকুমারের অভিলাষ জানাল। ধাত্রীর উপর অসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে রাজকুমারী তাকে আলতো করে গলাধাক্কা দিয়ে অন্তঃপুরের খিড়কীর দরজা দিয়ে বার করে দিলেন। ধাত্রী বিমর্ষমনে এসে রাজকন্যার হাতে কিভাবে তাকে অপমানিত হতে হয়েছে তার কথা বলল রাজকুমারকে। রাজকুমার বিফল মনোরথ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে নিরাশ হতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, এতো শুভসঙ্কেত; রাজকুমারী নিজেই ব্যাকুল তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ধাত্রীর গলায় হাত দিয়ে রাজকন্যা পদ্মাবতী তার প্রশস্ত হৃদয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। ধাত্রীকে খিড়কীর দরজা দিয়ে বার করে দিয়ে তিনি রাজকুমারকে আজ রাত্রেই ঐ খিড়কী দিয়ে অন্তঃপুরে তাঁর কাছে যাওয়ার সঙ্কেত জানিয়েছেন। রাজকুমার বজ্রমুকুট বন্ধুর এই কথা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, অধীর আগ্রহে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকলেন।

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে রাজ-অন্তঃপুরের খিড়কীতে উপস্থিত হলেন। মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। রাজকুমার খিড়কীর দরজা দিয়ে প্রাসাদে ঢুকেই দেখেন রাজকুমারী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। দুজনে দুজনকেই দেখেই আনন্দমগ্ন হলেন। রাজকুমারী ঈশারা করে

রাজকুমারকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন; রাজকুমারীর ঘরে তাঁর সখীরা ছাড়া আর কারোরই প্রবেশাধিকার ছিল না। সুশোভিত স্বর্ণপালঙ্কে রাজকুমারকে বসিয়ে নিজেরই সঞ্চয়িত মালতীফুল দিয়ে নিজের হাতে গাঁথা ফুলমালা পরিয়ে দিলেন রাজকুমারের গলায় তিনি। তালপাতার পাখা দিয়ে রাজকুমারকে হাওয়া দিতে লাগলেন। রাজকুমার রাজকন্যাকে হাওয়া করতে দেখে খুবই অস্বস্তি বোধ করলেন। তিনি রাজকুমারীকে তালপাতার পাখাটি নাড়তে বারণ করে বললেন, 'তোমার এই সুন্দর করপল্লব ফুলের চেয়েও কমনীয়, এই হাতে তালপাতার বোঁটা ধরা মানায় না; বরং তালপাতার পাখাটিকে আমাকেই দাও। আমিই তোমার সেবা করে ধন্য হই।' রাজকুমারের এই কথা শুনে রাজকুমারীর এক সহচরী পাখাটি নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। তারপর রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরী-দের সাক্ষী করে গান্ধর্বমতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিবাহানুষ্ঠানের শেষে সহচরীরা নবদম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন ভোরবেলায় রাজকুমার ঘুম থেকে উঠেই মন্ত্রীপুত্রের কাছে যাওয়ার অভিপ্রায় জানালেন রাজকুমারীর কাছে। রাজকুমারী স্বামীকে অভয় দিয়ে বললেন যে তিনি তার ঘরে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, কেননা, তার ঘরে সহচরীরা ছাড়া অন্য কারোরই প্রবেশের অধিকার নেই। তা শুনে বেশ খুশী হয়েই রাজকুমার রাজ-অন্তঃপুরে স্ত্রীর কাছেই থেকে গেলেন।

ক্রমে একমাস কেটে গেল। এবারে রাজকুমার স্থিরচিত্ত হলেন যে তিনি মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা করবেনই। মন্ত্রীপুত্রের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্যেই রাজকন্যাকে সে লাভ করেছে। তার সঙ্গে এতদিন দেখা করতে না পারায় মন্ত্রীপুত্র নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করছে—এ চিন্তা তাঁর মধ্যে এল। কিন্তু রাজকন্যা তাঁকে কিছুতেই একদিনের জন্যও ছেড়ে থাকতে চান না। শেষে একদিন রাজকুমারকে অত্যন্ত মনমরা অবস্থায় মাথা গুঁজে বসে থাকতে দেখে

তাঁর স্ত্রী বললেন তাঁকে, 'সত্যিই, আমি অন্যায় করেছি তোমার বন্ধুর কাছে তোমাকে যেতে না দিয়ে। যাঁর বুদ্ধি-পরামর্শ ও বিচক্ষণতার জন্য তুমি আমাকে বিবাহ করতে পেরেছ, অবিচারই করেছি আমি তাঁর প্রতি। তুমি আমার জন্যেই তার কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে; অকৃতজ্ঞতার মত অপরাধ আর কিছু নাই। সেজন্যে আমি তোমার কাছে খুবই লজ্জিত এবং স্বভাবতই বেশ বিব্রতবোধ করছি। যাই হোক, এখনও তার প্রতিবিধানের উপায় আছে। আমি নিজের হাতে কিছু মিষ্টি তৈরি করেছি। তুমি তা নিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে আজই যাবে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেরী হওয়ার জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আজই ফিরে আসবে তুমি আমার কাছে। হ্যাঁ আর একটা কথা। তুমি একটা মিষ্টি অন্তত তাকে খেতে বলবে তোমার সামনে। আমার হাতে তৈরি মিষ্টি কিরকম হয়েছে জেনে আসবে তার কাছে।'

স্বামীর সঙ্গে যে মিষ্টি রাজকুমারী পাঠিয়েছিলেন মন্ত্রীপুত্রের জন্য তাতে তিনি বিষ মাখিয়ে রেখেছিলেন। রাজকুমারী পদ্মাবতীর এই ধারণা হয়েছিল যে এই গোপন বিবাহের পিছনে যে রহস্য-সূত্র ছিল তা তাঁর স্বামীর বন্ধু মন্ত্রীপুত্র উদ্ধার না করলে রাজকুমারের পক্ষে এগোনো সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই এই বিবাহের ব্যাপারে মন্ত্রীপুত্র তাঁর কৃতিত্বের কথা তাঁর বন্ধুমহলে নিশ্চয়ই বলবেন বিশদভাবে এবং পরিণামে চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে যাবে তাঁর কলঙ্কের কথা রাজ্য জুড়ে। তাই মন্ত্রীপুত্রের জন্য পাঠানো মিষ্টিতে তিনি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

বারাণসীতে গিয়ে রাজকুমার বজ্রমুকুট মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা করে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কিছু দেরী হয়ে গেল। বন্ধু যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন, বিনম্র সুরে বললেন বজ্রমুকুট। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছাড়তেই চাইছিলেন না, বজ্রমুকুট জানালেন বন্ধুকে—যখন তাঁর স্ত্রী জানলেন যে মন্ত্রীপুত্রের বুদ্ধি ও

বিচক্ষণতার জন্য তাদের দুজনের মিলন সম্ভব হয়েছিল, তখন তিনি তাঁকে পাঠালেন মন্ত্রীপুত্রের কাছে মিষ্টান্নসহ। রাজকুমার বন্ধুকে তাঁর স্ত্রীর দেওয়া মিষ্টি খেতে বললেন। তিনি তাঁকে জানালেন, তাঁর স্ত্রীর অভিপ্রেত, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রদত্ত তারই হাতে বানানো মিষ্টির শিল্প-নৈপুণ্য মন্ত্রীপুত্র কিরকম তারিফ করেন শোনা।

রাজকুমারের বন্ধুবর সব শুনে ও দেখে বললেন, 'তুমি আমার জন্য কালকূট এনেছ নিজেরই অজ্ঞাতে। এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে তুমি এই মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ কর নি ; তা করলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য ছিল। তুমি খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ, রাজকুমার: কার কি মনের ভাব বুঝতে পার না, স্বেচ্ছাচারী রমণীরা আপন প্রিয়তম পুরুষের প্রিয়পাত্রের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়। সুতরাং তুমি তাঁকে আমার সম্পর্কে সপ্রশংস কথা বলে সঙ্গত কাজ কর নি।' বজ্রমুকুট বন্ধুর এই কথায় ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারলেস না। তিনি বললেন বন্ধুকে, 'তোমার একথা খুবই আপত্তিকর। যাকে আমি ধর্মসাক্ষী করে গান্ধর্বমতে বিয়ে করেছি, তার সম্পর্কে এজাতীয় কথা বলে তুমি তার চরিত্রের তো অপযশ করলেই, এতে আমারও অপবাদ হল। সুকুমারমতি রাজকন্যাটির সহৃদয় স্বভাবের কথা তুমি কিছুই জান না। তোমার প্রাণনাশের জন্য সে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে পাঠানো মিষ্টান্নের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছে, একথা বললে তুমি কিভাবে! আমার নিষ্পাপ স্ত্রীর উপর অপরাধের কলঙ্ক চাপিয়ে তুমি আমার শত্রুতাই করলে। তার প্রমাণ আমি দিচ্ছি। এই ঘরের বিড়ালটিকে একটা মিষ্টি খাইয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তুমি কতটা খল প্রকৃতির মানুষ।' কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীপুত্র বিড়ালটিকে একটি সন্দেশ খেতে দিলেন। বিড়ালটি জ্বলজ্বল চোখে গপ করে সন্দেশটি খেয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যন্ত্রনায় কুঁকড়ে উঠে বিড়ালটি মারা গেল।

এই দৃশ্য দেখে রাজকুমার বজ্রমুকুট আর্তনাদ করে বলতে

লাগলেন, এই ছলনাময়ী রমণীর সঙ্গে আমি আর ঘর করব না। এর সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেব। বন্ধু, তুমি আমার প্রকৃতই হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমার কথা আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। তোমাকে অনেক কটুকথা বলে ফেলেছিলাম, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। স্ত্রীকে আমার পরিত্যাগ করতেই হবে।' রাজকুমারকে আর কথা বলতে না দিয়ে মন্ত্রীপুত্র বললেন, 'পরিত্যাগ করার কথা এখন থাক্, তার চেয়ে বরং একটা কাজ কর। তুমি স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও। তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করবে। তুমি তাঁকে বলবে যে মিষ্টান্ন খাওয়ার অব্যবহিত পরেই মন্ত্রীপুত্র অচেতন হয়ে পড়ে। তাঁর জ্ঞান ফিরবার অপেক্ষায় আমি কিছুক্ষণ ছিলাম সেখানে, কিন্তু তোমার কথা মনে হওয়ায় আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলাম না। তোমাকে একমুহূর্ত না দেখলে প্রাণ ছটফট করে, তাই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। কখনই আর ছেড়ে থাকব না তোমাকে। এইসব মন ভোলানো কথা বলে স্ত্রীকে, সারাদিন তার কাছে কাটাবে। রাত্রে ঘুমোবার জন্য তোমরা যখন বিছানায় শোবে, তুমি জেগে থাকবে, তোমার স্ত্রী যখন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হবে তখন তার গা থেকে সব গহনা খুলে নিয়ে একটা পোটলায় বাঁধবে আর তার বাম জঙ্ঘায় একটা ত্রিশূল চিহ্ন এঁকে দিয়ে পৌটলাটি নিয়ে চলে আসবে আমার কাছে।' রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রের পরামর্শমত কাজ হাসিল করে ফিরে এলে তাকে নিয়ে মন্ত্রীপুত্র কর্ণাট নগরে এক শ্মশানে এসে সন্ন্যাসীর বেশ পরলেন, রাজকুমারকেও সন্ন্যাসীর বেশে সাজালেন। মন্ত্রীপুত্র নিজেকে গুরু এবং রাজকুমারকে শিষ্য হিসাবে পরিচিত করালেন শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী-যোগীদের কাছে। গহনার পুঁটলিটি রাজকুমারকে দিয়ে মন্ত্রীপুত্র তাঁকে শহরে বিক্রি করে আসতে বললেন। আর এও বলে দিলেন, যদি তাঁকে কেউ গহনা চোর হিসেবে সাব্যস্ত করে, তাহলে তাকে যেন শ্মশানে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়।

ছদ্মবেশী রাজকুমার সেই অলঙ্কারের পুঁটলি নিয়ে রাজপ্রাসাদের কাছে এসে এক স্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কারগুলি বার করে বিক্রির জন্য দেখালেন। অলঙ্কারগুলি দেখার পর স্বর্ণকারের কেমন যেন সন্দেহ হল। রাজকন্যার জন্যে তো সে কিছুদিন আগে এইরকম অলঙ্কারই বানিয়ে দিয়েছিল। সে চিন্তা করে কুল পেল না, এই বিদেশী লোকটি, তায় আবার সন্ন্যাসী, কোথা থেকে এসব সংগ্রহ করল। স্বর্ণকার তখন নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তার কারিকরদের অলঙ্কারগুলি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এগুলো তাদের বানানো কিনা। কারিকরেরা তা পরীক্ষা করে দেখে বলল, হ্যাঁ. ওগুলো তাদেরই বানানো। তখন স্বর্ণকার ছদ্মবেশী রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করল, রাজকুমারীর এই অলঙ্কারগুলো সে কোথা থেকে পেয়েছে। নিশ্চয়ই সে চুরি করেছে, উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল সে, স্বর্ণকারের চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশ থেকে অনেক লোক এসে ভিড় করল দোকানে। ঘটনাটির কথা লোকমুখে নগরপালের কাছে পর্যন্ত নিমেষে পৌঁছে গেল। নগরপাল লোক পাঠিয়ে ছদ্মবেশী রাজকুমার আর স্বর্ণকারকে তাঁর দপ্তরখানায় আনলেন। সেখানে ছদ্মবেশী রাজকুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নগরপাল জানতে পারলেন, শ্মশানে অবস্থানরত এক সন্ন্যাসী তার গুরু। গুরুদেবই শিষ্যকে পাঠিয়েছেন এই অলঙ্কারগুলিকে শহরে বিক্রি করতে। সঙ্গে সঙ্গে নগরপাল শ্মশান থেকে তার গুরুকে লোক দিয়ে আনিয়ে গুরু-শিষ্যকে কর্ণাটনগরের রাজা দন্তবাটের কাছে ধরে নিয়ে গেলেন।

সন্ন্যাসীর জিম্মায় রাজকন্যার অলঙ্কারগুলি থাকার ব্যাপারটি বেশ রহস্যজনক বলেই মনে হল রাজার কাছে। তিনি বয়স্ক সন্ন্যাসীটি অর্থাৎ ছদ্মবেশী মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গোপনে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় তিনি এসব অলঙ্কার পেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'মহারাজ, কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রিতে ডাকিনীমন্ত্র জপ করেছিলাম। মন্ত্রের মহিমায় ডাকিনী স্বয়ং আমার সামনে এসে উপহারস্বরূপ তার গায়ের

সমস্ত অলঙ্কার খুলে আমাকে দিয়ে গেছে। আমি আমার মন্ত্রসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ তার বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।' একথা শুনেই পদ্মাবতী সম্পর্কে রাজা সন্দিহান হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে এসে মহিষীকে বললেন, 'ত্যাখ তো, মেয়ের বাম জঙ্ঘাতে কোন ত্রিশূলের চিহ্ন আছে কিনা।' মহিষী কিছুক্ষণ পর এসে রাজাকে বললেন, 'হ্যাঁ, আশ্চর্যের ব্যাপার। পদ্মাবতীর বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশূলের একটা চিহ্ন রয়েছে।' এমন অঘটন যে ঘটতে পারে রাজার কল্পনার বাইরে ছিল। তিনি হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে পড়লেন। বিষয়টির কথা রাজ্যের লোকেরা জানতে পারলে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার হবে তাঁর কাছে বুঝলেন। এখন করবেন কী, ভাবতে লাগলেন রাজা। প্রাসাদ থেকে কন্যাকে বহিষ্কার করলেও সেটা অধর্মের কাজ হবে ভাবলেন। পরক্ষণে ঠিক করলেন, পণ্ডিতসমাজের শিরোমণিদের ডেকে এনে তাঁদের পরামর্শমত কাজ করবেন—শাস্ত্রসিদ্ধ বিধান যা দেবেন তাঁরা তাই মেনে নেবেন। কিন্তু আবার ভেবে দেখলেন, শাস্ত্রেই বলা হয়েছে ঘরের ছিদ্র বাইরে কোনভাবেই প্রকাশ করতে নেই ; তাতে আরও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাঁর ঘরের কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে দেশে। শেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সন্ন্যাসীটির পরামর্শ অনুযায়ীই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অপরাধী স্ত্রীলোকটির কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত—সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা। সন্ন্যাসী কপটভাবে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন আপনি একথা বলছেন।' রাজা তখন বললেন, অলঙ্কারগুলি তাঁর কন্যার· কন্যার জঙ্ঘাতেই ত্রিশূলের চিহ্ন রয়েছে। সন্ন্যাসী মনে মনে হাসলেন, এসব তো তারই সাজানো ব্যাপার। কিন্তু মুখে কোন ভাবান্তর না এনে বেশ গম্ভীরভাবে রাজাকে বললেন তিনি, স্ত্রীলোক ও বালকেরা অপরাধী হলেও তাদের গুরুতর শাস্তি দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। সকলের অজ্ঞাতে পদ্মাবতীকে গোপনে কর্ণাটনগরের উপকণ্ঠে যে বনাঞ্চল আছে সেখানে রেখে আসলেই

চরম শাস্তি হবে তার। এ ব্যাপারে সতর্কভাবে গোপনতা রক্ষা করলে রাজপরিবারের সম্ভ্রমও অক্ষুন্ন থাকবে।

রাজা সন্ন্যাসীর দেওয়া পরামর্শকেই সবিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে করে অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীকে বললেন, 'পদ্মাবতী এখন অত্যন্ত অসৎ প্রকৃতির মেয়ে হয়েছে। তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ওকে আমি রাজপ্রাসাদ থেকে নির্বাসন দিচ্ছি।' রাজার এই ভয়ঙ্কর কথায় রাণী শিউরে উঠলেন, কিন্তু তিনি যখন রাজার মুখ থেকে সব শুনলেন তখন তিনিও কন্যার এই নির্বাসনে সায় দিলেন। তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজকন্যার কাছে গিয়ে রাজা বললেন, 'তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।' পদ্মাবতী দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিলেন। পালকী-বাহকেরা পদ্মাবতীকে পালকীতে চড়িয়ে পদ্মাবতীর অজ্ঞাতে তাকে নিয়ে নগরের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে এক গাছের তলায় এনে নামল। পদ্মাবতী হতবুদ্ধি হয়ে গেল. কেন পালকী বাহকেরা তাঁকে গাছের তলায় বসিয়ে চলে গেল কিছুই বুঝতে পারল না সে। একটু পরেই জঙ্গলের নির্জন নিরালা জায়গায় তার বেশ ভয় হতে লাগল। ভয়ে আতঙ্কে কান্না এসে গেল তার। ছদ্মবেশ ছেড়ে রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র ঠিক সেই সময় আত্মপ্রকাশ করলেন রাজকন্যার কাছে। পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পদ্মাবতী মন্ত্রীপুত্রের মুখের দিকে তাকাতেই পারলেন না। তিনি রাজকুমারের কাছ থেকে সব শুনে বুঝলেন মিষ্টির সঙ্গে তিনি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন যার জন্য, সে তো আসলে অকৃত্রিম বন্ধু তাদের দুজনের। রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত মার্জনা করেছেন বললেন। তারপর পদ্মাবতীকে নিয়ে রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র বারাণসীতে ফিরে এলেন। রাজা প্রতাপমুকুট ও রানী মহাদেবী পুত্র ও পুত্রবধূকে পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বারাণসীতে মহোৎসব অনুষ্ঠানের আদেশ দিলেন রাজা।

আখ্যানটি শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, কর্ণাটনগরের রাজা ও মন্ত্রীপুত্র (বারাণসী), এই দুজনের মধ্যে কে দায়ী ও দোষী পদ্মাবতীর নির্বাসনের জন্য। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন 'আমার মতে রাজা।' বেতাল কারণ জানতে চাইলে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আততায়ীর বধে এবং অত্যাচারীর প্রতি বিদ্রোহ দোষনীয় নয়। রাজকন্যা মন্ত্রীপুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। সে কারণে তাঁর নির্বাসনের ব্যাপারে মন্ত্রীপুত্রের হাত থাকলেও তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু রাজা অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির কথায়, কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই, বিচার-বিবেচনা না করেই কন্যাকে নির্বাসন দিলেন এর ফলে রাজধর্মের বিরুদ্ধ কাজ করে তিনি পাপকাজই করেছেন।'

দ্বিতীয় উপাখ্যান

যমুনার তীরে জয়স্থল নগরে কেশব শর্মা নামে এক নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধুমালতী নামে তাঁর এক সুকুমারী কন্যা ছিল। কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হলে তার পিতা ও সহোদর ভাই পাত্রের সন্ধানে উদ্‌যোগী হলেন।

কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ তাঁর এক যজমানের পুত্রের বিবাহোপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্য দূরে এক গ্রামে যজমানটির বাড়ী গেলেন। তাঁর পুত্রও অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে বসবাস করতে চলে গেল। দুজনেরই অনুপস্থিতে একদিন এক সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমার কেশবের ঘরে অতিথি হয়ে এলেন। কেশবের স্ত্রী ব্রাহ্মণকুমারটির বিদ্যাবত্তা ও রূপ দেখে ঠিক করলেন তাকেই জামাতা করবেন, অবশ্য যদি সে সদ্বংশজাত হয় এবং এই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হয়।

আন্তরিক আদর-যত্নসহ অতিথিসৎকার করে ব্রাহ্মণকুমারের কাছে ব্রাহ্মণী তার কুলপরিচয় জানতে চাইলে সবিনয়ে ব্রাহ্মণকুমার তার বংশপরিচয় দিলে ব্রাহ্মণী খুবই আনন্দিত হলেন তার সদ্বংশের

কথা জেনে। তখন তিনি তার কাছে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব পাড়লেন। অপরূপ সুন্দরী মধুমালতীকে দেখে ব্রাহ্মণকুমার মুগ্ধ হয়ে গিয়ে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহ প্রত্যাবর্তনের দিন পর্যন্ত সে ব্রাহ্মণীর অতিথি হয়ে থাকল।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্র একে একে গৃহে ফিরলেন। দুজনেই মধুমালতীর জন্য একটি করে পাত্র নিয়ে এলেন। এদিকে ব্রাহ্মণীও এক পাত্র ঠিক করে রেখেছেন। ব্রাহ্মণ তো মহা প্রমাদ গুণলেন। তিনজন পাত্রকেই কথা দেওয়া হয়েছে, অথচ প্রয়োজন একজন পাত্রের—চিন্তায় চিন্তায় সারা হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ।

ইতিমধ্যে, এক মহা বিপদ ঘটে গেল কেশব শর্মার ঘরে। বিষধর এক সাপের ছোবলে মধুমালতী বাড়ীর উঠোনে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মেয়েকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর ব্রাহ্মণ নিজের কান্নার বেগ সামলিয়ে নিয়ে কয়েকজন সর্প বিশারদ বৈদ্যকে ডেকে আনলেন কন্যার আরোগ্য লাভের জন্য। বৈদ্যরা মেয়েটির দেহ থেকে সাপের বিষ তোলার জন্য শত চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারলেন না। তখন তাঁরা কেশবকে বললেন—সাপটি এমন সময় মধুমালতীকে দংশন করেছে যে বার তিথি নক্ষত্রের দোষ পড়েছিল তখন। তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন স্বয়ং ধন্বতরী এলেও এই মেয়েটির প্রাণরক্ষা করতে পারবেন না। তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণের গৃহ পরিত্যাগ করলেন।

বৈদ্যরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মধুমালতীর প্রাণবিয়োগ হয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ-পুত্র হতবাক হয়ে নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তিন পাত্রও বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল।

শোকাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-পুত্র ও তিন পাত্র মধুমালতীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করলেন। দাহ-শেষে ব্রাহ্মণ প্রায় উন্মত্ত হয়ে গেলেন। তিন পাত্রও এমন অসামান্যা পাত্রীর এরকম আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুতে—তার এই দুঃসহ অকাল বিয়োগে

স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারলেন না আর। তারা তিনজনই বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করবেন স্থির করলেন। প্রথম পাত্র ত্রিবিক্রম চিতা থেকে মধুমালতীর কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে তা কাপড়ে বেঁধে নিজের ঘরে রেখে দিয়ে দেশে দেশে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দ্বিতীয় পাত্র বামন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। তৃতীয় পাত্র মধুসূদন সেই শ্মশানের এক প্রান্তে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে মধুমালতীর দেহ ভস্ম সামনে রেখে যোগাসনে বসলেন।

একদিন বামন তীর্থভ্রমণ করতে করতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণ খেতে বসেছিলেন। তিনি অতিথিকে সমাদর করে বসিয়ে বললেন যে যদি তিনি তার মতো দীনের গৃহে অন্নগ্রহণ করেন তাহলে কৃতার্থ হবেন তিনি। সন্ন্যাসী সম্মত হয়ে ভোজনে বসলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করতে লাগলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের পুত্র অশান্ত হয়ে গিয়ে পরিবেশনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল। ব্রাহ্মণী নানাভাবে তার শিশুপুত্রকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, কোন প্রবোধ বাক্যেই কাজ হল না। তখন উত্তেজিত হয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণী শিশুপুত্রকে প্রজ্জ্বলিত চুল্লীতে নিক্ষেপ করে নির্বিঘ্নে পরিবেশন করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণের এইরূপ অমানুষিক আচরণ দেখে সন্ন্যাসীর মনে খাবারের প্রতি বিতৃষ্ণা এল এবং তিনি খাবারের পাত থেকে উঠে পড়লেন। ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি খাবার না খেয়ে উঠে যাচ্ছেন। সান্ন্যাসী উত্তর দিলেন, সেখানে সন্তানের প্রতি এইরকম রাক্ষসোচিত ব্যবহার করা হয়, সেখানে একদণ্ডও থাকা উচিত নয়, ভোজনের প্রবৃত্তিই বা আসে কি করে সেখানে? ব্রাহ্মণ তখন অবিচলিত মনে ঘর থেকে একটি গ্রন্থ এনে তা থেকে একটি মন্ত্র জপ করলেন; পুত্র তখনই প্রাণ ফিরে পেয়ে আবার আগের মত দুষ্টুমি করতে লাগল। সন্ন্যাসী বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ঐ গ্রন্থে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র আছে, ঐ মন্ত্র জপ

করলে মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়। সন্ন্যাসীটি ঐ গ্রন্থ হস্তগত করতে মনস্থ করল। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, রাতটাতেও তিনি ব্রাহ্মণের ঘরেই কাটিয়ে যাবেন। ব্রাহ্মণ খুবই যত্নআত্তি করে সন্ন্যাসীকে রাতে একটি আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। মাঝরাতে বাড়ীর সকলে যখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, তখন সন্ন্যাসী বিছানা থেকে উঠে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা সঞ্জীবনী গ্রন্থটি নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন। রাতের আঁধার কেটে যেতে না যেতেই কাকপক্ষী ডাকার আগেই তিনি গ্রন্থটি নিয়ে সকলের অগোচরে ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করে যমুনাতীরে জয়স্থলের সেই শ্মশানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে মধুসূদন অনতিদূরে এক পর্ণকুটীরে যোগসাধনায় বসে আছেন। সেই দিনই দৈববলে ত্রিবিক্রমও সেখানে এসে হাজির হল।

তিনজনে একত্র হলে বামন বললেন যে তিনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখেছেন। তিনি অন্য দুজনকে বললেন তাঁরা যদি অস্থি ও ভস্ম একত্র করেন, তাহলে তিনি মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে প্রাণদান করতে পারবেন। অস্থি ও ভস্ম একত্র করা হলে সঞ্জীবনী মন্ত্রে মাংস অস্থি শোণিত সৃষ্টি হয়ে মধুমালতীর আবার নবজন্ম হল। মধুমালতীর অপূর্ব কান্তি ও লাবণ্য দেখে তিন পাত্রই বিমোহিত হয়ে গেলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মধুমালতীকে দাবি করলেন।

এই পর্যন্ত বলে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ, এই তিনজনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মধুমালতীর পাণিগ্রহণ করার যোগ্য।' রাজা উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তি কুটীর তৈরী করে শ্মশানে যোগসাধনায় মগ্ন ছিলেন, তিনিই রাজকন্যার পতি হওয়ার যোগ্য।' তখন বেতাল বললেন, 'যদি ত্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চয় না করত এবং বামন দেশে দেশে ঘুরে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র না জানতে পারত তাহলে মধুমালতীর প্রাণ লাভ হত কিভাবে।' বিক্রমাদিত্য বেতালের কথাতেই সায় দিয়ে একটি বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন; সেটি হল,

তিনি বললেন, 'অস্থি সংগ্রহের জন্য ত্রিবিক্রম মধুমালতীর পুত্রস্থানীয় হয়েছে আর বামন জীবনদান করে মধুমালতীর পিতৃস্থানীয় হয়েছে; সুতরাং তারা মধুমালতীর প্রণয়ী হতে পারে না, কিন্তু মধুসূদন ভস্ম-রাশি-সংগ্রহ ও পর্ণকুটির তৈরি করে শ্মশানবাসী হয়ে মধুমালতীর যথার্থ প্রণয়ীর কাজ করেছে। সুতরাং তার পক্ষেই মধুমালতীকে বিবাহ করা সাজে।'

তৃতীয় উপাখ্যান

বর্ধমানের সুপণ্ডিত, গুণগ্রাহী ও উদারহৃদয় রাজা রূপসেনের কাছে দক্ষিণদেশের অধিবাসী বীরবর নামে এক ক্ষত্রিয় কর্মলাভের জন্য সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন একদিন। রাজপ্রাসাদের প্রহরী রাজার সম্মতি নিয়ে তাকে রাজসমীপে নিয়ে এল।

বীরবরের বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখে রাজা তাকে প্রথম নজরেই বেশ কর্মদক্ষ বলে মনে করলেন। কি বেতন সে প্রত্যাশা করে, রাজা বীরবরের কাছে জানতে চাইলে সে বলল, প্রতিদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারবে সে। বীরবর রাজাকে জানাল, সে, তার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাকে নিয়ে চারজনের সংসার তার। রাজা বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এর এই ছোট পরিবার অথচ সে এই বিরাট অর্থ দাবি করছে। তাঁর ধারণা হল, নিশ্চয়ই এই ক্ষত্রিয়ের অশেষ গুণ ও ক্ষমতা আছে, নইলে এই বিরাট অঙ্কের অর্থ সে চাইবে কেন। তিনি ঠিক করলেন, কয়েকদিনের জন্য একে

কাজে নিযুক্ত করে দেখবেন, কি যোগ্যতা আছে তার এই বিরা অঙ্কের অর্থের দাবীদার হতে। তখন তিনি বীরবরকে কাজে নিযু করলেন এবং কোষাধ্যক্ষকে বললেন প্রতিদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নতু এই কর্মচারীটিকে দিতে।

রাজা বীরবরকে রাজপ্রাসাদে প্রতিরাত্রের জন্য রাজাজ্ঞা পাল করার কাজে নিযুক্ত করলেন। কোষাধ্যক্ষ সেইদিনের মত এব হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়ে দিলেন। বীরবর রাজার কাছে সবিশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট করা বাসস্থানে চলে গেল। ঘ এসে প্রথমে সে স্বর্ণমুদ্রাগুলোকে সমান দুইভাগে ভাগ করল। এব ভাগ সে ব্রাহ্মণদের দান করল। বাকী মুদ্রাগুলি আবার দুইভাগ করল। একভাগ সে বৈষ্ণব বৈরাগী ও সন্ন্যাসীকে দিল, অপরভাগটির প্রায় সবটাই সে শত শত দীন দুঃখী অনাথকে পরিতৃপ্ত সহকারে খাওয়াবার জন্য ব্যয় করল। অবশিষ্ট যৎসামান্য অর্থ যা থাকল, তাই দিয়ে সেদিনের জন্য তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও নিজের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য ব্যয় করল। প্রতিদিন এইভাবে তার দিন কাটে আর সারারাত সে রাজপ্রাসাদে রাজাজ্ঞা পালনে নিযুক্ত থাকে।

একদিন মাঝরাতে দূর থেকে স্ত্রীলোকের কান্নার রোল শুনে রাজা বিচলিত হয়ে বীরবরকে পাঠালেন সেই কান্নার রহস্যভেদ করতে। নিশুতি রাতে দক্ষিণদিক থেকে সেই কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। বীরবর রাজাজ্ঞা পালনে মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রাজপথ ধরে দক্ষিণদিকে চললেন। কর্তব্যপালনে বীরবরের নিষ্ঠা দেখে রাজা বেশ খুশীই হলেন। তিনি তার সাহস ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার জন্য নিঃশব্দে তার অজান্তে তার পিছন পিছন চললেন। বীরবর নারীকণ্ঠের সেই ক্রন্দনের আওয়াজ লক্ষ্য করে এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে এসে উপস্থিত হল। সেখানে দেখল সে হতবাক বিস্ময়ে, অলঙ্কারভূষিতা ও অসামান্যা সুন্দরী এক রমণী মাথায় করাঘাত করতে করতে আর্তস্বরে কেঁদে চলেছে। বীরবর তার কাছে

গিয়ে জানতে চাইল, কে সে, কেনই বা এত রাত্রে ভয়ঙ্কর এই শ্মশানে এসে বিলাপ করে কেঁদে চলেছে সে। রমণীটি কোন উত্তর না দিয়ে আগের চেয়ে আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করল। আবার বীরবর তাকে ব্যগ্রস্বরে একই কথা জিজ্ঞেস করতে সে তার কান্নার আওয়াজ নীচু খাদে নামিয়ে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে শুরু করল, 'আমি রাজলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায় কাজ নির্বাধায় চলছে। সেকারণে রূপসেনের ঘরে অলক্ষ্মী ঢুকে সব ছারখার করে দেবে। রাজার ওপর আমার অধিকার হারিয়ে আমাকে এরাজ্য পরিত্যাগ করতে হবে তখন। ফলে আমার রাজগৃহ ত্যাগের কয়েকদিন পরেই রাজার মৃত্যু হবে অবধারিতভাবে।'

প্রভুর ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় বীরবর উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সে রাজলক্ষ্মীর কাছে আরজি করল যদি এই মর্মান্তিক অমঙ্গল নিবারণের জন্য কোন উপায় থাকে, তাহলে তা প্রকাশ করতে। সে দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করল রাজার এই সর্বনাশ রোধে যদি তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, সে হাসিমুখে তা করবে। দেবী বললেন তখন, পূবদিকে এক মন্দির আছে, যদি কেউ সে মন্দিরের দেবীর সামনে আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলি দেয়, তবেই তিনি সুপ্রসন্ন হয়ে রাজার অমঙ্গল নিবারণ করবেন।

বীরবর রাজলক্ষ্মীর নির্দেশ অনুযায়ী পুত্র-উৎসর্গে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে গৃহ-অভিমুখে রওনা দিল। রাজা রূপসেন নিঃশব্দে বীরবরকে অনুসরণ করতে করতে তার বাড়ীর পাশে এসে আড়াল থেকে বীরবর আর তার বাড়ীর লোকদের কথাবার্তা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন। বীরবর বাড়ীতে এসে তার স্ত্রীর কাছে রাজলক্ষ্মীর নির্দেশের কথা খুলে বলল। তারপর পুত্রকেও সব কথা বলে জানতে চাইল তার কাছে, সে একাজে সম্মত আছে কিনা। পুত্র সানন্দে রাজী হয়ে বলল, পিতার আজ্ঞাপালন পুত্রের অবশ্য কর্তব্য, তাছাড়া যে শরীর একদিন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে, তাকে কারোর মঙ্গলের কারণে বা কারোর

প্রাণরক্ষায় উৎসর্গ করলে জীবনের চরম সার্থকতা হয় এবং প্রাণত্যাগের উপযুক্ত সময় এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে না। পুত্র তার জীবন উৎসর্গে সম্মতি দিতে যে তত্ত্বকথার অবতারণা করল তা শুনে বীরবর অশ্রুসংবরণ না করে পারলেন না। তারপর স্ত্রীর কাছে জানতে চাইল সে, তার সম্মতি আছে কিনা এব্যাপারে। স্ত্রী বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলল, স্বামীর কর্তব্যপালনে স্ত্রীকে সহায়তা করতেই হবে। স্বামীর পুণ্যেই স্ত্রীর পুণ্য। স্বামী বধির, পঙ্গু, কুব্জ, অথর্ব যেরকমই হোক না, তার কর্তব্যকর্মে সামিল হওয়া স্ত্রীজীবনের পূর্ণ সার্থকতা। শাস্ত্রসিদ্ধ পূজা-যজ্ঞ দান ধ্যান তপস্যায় সে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। তখন বীরবর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে পূবদিকে সে দেবীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হল। রাজা রূপসেন সপরিবাবে বীরবরের এই প্রভুভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে মন্দিরের কাছে এক জায়গায় নিজেকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

রাজা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে দেখলেন, পিতা পুত্রকে দেবীর সামনে বলি দিল নির্বিকারভাবে, বীরবরের কন্যা তা দেখে খড়্গ দিয়ে নিজের গলা কেটে দেবীর কাছে আত্মবলিদান করল, বীরবরের পত্নীও পুত্র-কন্যার প্রাণ-উৎসর্গ প্রত্যক্ষ করে মুহূর্তে নিজের শিরশ্ছেদ করল, পুত্র ও কন্যার অনুগামী হল সে। পরিশেষে বীরবরও নিজের জীবন অমূলক বিবেচনা করে সেই খড়্গ দিয়ে আত্মহত্যা করল। চারজনকে একে একে অবলীলায় এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে রাজা বুঝলেন রাজ্যের স্বার্থে ও রাজার প্রাণ রক্ষার্থে একটি সম্পূর্ণ পরিবারই আত্মাহুতি দিল। এমন প্রভুভক্ত সেবকের এই মহা সর্বনাশে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর কাছে এই রাজ্য বিষম এক স্থান বলে মনে হল, এই রাজ্যভোগে আর তার প্রবৃত্তি হল না। তিনি নিজেকে অত্যন্ত স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বলে মনে করলেন, নতুবা তিনি বীরবরকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন। আত্মহননের

সংকল্প করে তিনি নিজের শিরোশ্ছেদন করতে খড়্গ তুললেন যেই মুহূর্তে, ভগবতী কাত্যায়নী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। দেবী তাঁকে বললেন, 'তোমার বিবেকবোধ ও সদ্বিবেচনায় আমি অশেষ প্রীত হয়েছি। তুমি আমার কাছে যে



বরই প্রার্থনা করবে, আমি তাই পূরণ করব।' রাজা দেবীর কাছে তখুনই প্রার্থনা জানালেন ঐ চারজনের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে 'তথাস্তু' বলে দেবী অন্তর্ধান করলেন। চারজনই প্রাণ ফিরে পেয়ে সামনেই ছাখে রাজা রূপসেন দাঁড়িয়ে আছেন। দেবীর মাহাত্ম্যের কথা বললেন তাদের রাজা। তাঁরই অভিপ্রায়ে পুণ্যবান

বীরবর ও তাঁর পরিবারের সকলে প্রাণ ফিরে পেয়েছে বললেন রাজা।

পরদিন রাজসভায় কাত্যায়নীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে অমাত্য ও রাজকর্মচারীদের সামনে রূপসেন বীরবরকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।

বেতাল কাহিনীটি শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে কার ঔদার্য অপেক্ষাকৃত বেশি বলে মনে হল তোমার।' বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, 'রাজার ঔদার্যই বেশি।' কারণ জানতে চাইলে বেতাল, উত্তর দিলেন তিনি, 'আদর্শবান স্বামীর স্বার্থে প্রাণদান করা স্ত্রীলোকের পুণ্যকর্ম। বীরবর সেরকমই প্রভুর স্বার্থে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে। এটি মহান কাজ অনস্বীকার্য, কিন্তু এটা অভাবনীয় নয়। কিন্তু যে রাজা রাজ্যের কারণে তাঁর এক সাধারণ সেবকের প্রাণবিসর্জনে কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে রাজ্যের মায়া ও নিজের জীবন তুচ্ছ করে অনায়াসে আত্মহনন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার তুলনা মানুষের ইতিহাসে কোনদিনই পাওয়া যাবে না।'

চতুর্থ উপাখ্যান

ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের চূড়ামণি নামে এক সর্বজ্ঞ শুকপাখি ছিল। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। রাজা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বিবাহ হবে কার সাথে। শুক জানাল, মগধসেনের রাজা বীরসেনের অতীব সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের যোগ রয়েছে। শুকের একথা শুনে রাজা এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের উপর ভার দিলেন মগধরাজার কাছে তাঁর মেয়ের সঙ্গে নিজের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করতে।

চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে সর্বজ্ঞ এক সারি ছিল। চন্দ্রাবতীও একদিন কৌতূহলী হয়ে সারিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের সঙ্গে তাঁর নির্বন্ধ হবে। এর ফলে অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা পরস্পরের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

মগধরাজের কাছে তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে রাজা অনঙ্গসেনের বিয়ের সম্বন্ধ তুলল যখন অনঙ্গসেনের প্রেরিত দূত, রাজা সোৎসাহেই তাতে সম্মতি দিলেন এবং তার সঙ্গে তাঁর এক দূতকে ভোগবতী নগরে

পাঠিয়ে দিলেন বিয়ের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে। শুভদিনে শুভক্ষণে অনঙ্গসেনের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হল এবং তাঁরা বেশ সুখেই দাম্পত্যজীবন শুরু করলেন। চন্দ্রাবতী পিতৃগৃহ থেকে সারিকেও সঙ্গে এনেছিলেন শ্বশুরালয়ে। অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী শুক-সারির বিয়ে দিয়ে তাদের দুজনকে একই খাঁচায় রেখে দিল। রাজারাণীর মধ্যে যে গভীর প্রেম তা লক্ষ্য করে, এবং সারির দাম্পত্যজীবনে অনীহা লক্ষ্য করে শুক একদিন সারিকে বলল, 'রাজারাণীর যে প্রেম, আমাদের মধ্যে তার বিন্দুমাত্রও নেই।' সারি পুরুষজাতিকে অভিসম্পাত দিয়ে বলতে লাগল তখন, পুরুষেরা শঠ, স্বার্থপর, অধর্মী ও স্ত্রীনির্যাতনকারী; এমনকি স্ত্রীহত্যাকারীও হয়। পুরুষের উপর তার জাতক্রোধ আছে বলে সে শুকের সঙ্গে কথা বলাই পছন্দ করে না। শুকও উত্তেজিত হয়ে বলল, নারীও চপলা, কুটিলা, মিথ্যাচারিণী, এমন কি পুরুষঘাতিনীও হয়। তাদের দুজনের মধ্যে যখন এরকম ঝগড়া চলছিল তখন রাজা তাদের জিজ্ঞেস করলেন কেন তারা অযথা ঝগড়াবিবাদ করছে। সারি উত্তর দিল, 'মহারাজ, শুকের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। পুরুষের মতো অধর্মচারী আমি আর দেখি নি। তাই পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বিন্দুমাত্র নেই। পুরুষের চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে আপনাকে একটা কাহিনী শোনাচ্ছি, আপনি একটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

ইলাপুরে মহাধন নামে এক ধনী বণিকের একমাত্র পুত্র নয়নানন্দ ছোটবেলা থেকে কুসংসর্গে পরে অমানুষ হয়ে যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে অসচ্চরিত্র হয়ে পড়ে। এই সময় আকস্মিক মহাধনের মৃত্যু হলে তাঁর এই অপদার্থ ছেলেটি তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়। পিতার যা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত নয়নানন্দ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে তা অল্পদিনের মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে ভীষণ দুর্দশার মধ্যে পড়ে মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলে। শেষে এক দুর্বুদ্ধি খেলে তার মধ্যে। সে তার পিতার বন্ধু চন্দ্রপুর-

নিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কাছে গিয়ে বলল যে সে কয়েকটি জাহাজ নিয়ে সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল কিন্তু দৈবের প্রতিকুলতায় সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় ওঠায় তার জাহাজগুলি জলে ডুবে যায়। একটা কাঠের টুকরোর উপর ভর দিয়ে সে কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করতে পেরেছে জানাল তাঁকে। এত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী খোয়া যাওয়ায় সে এখন নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করছে, দেশে যেতেও তার মন চাইছে না বলল। হেমগুপ্ত তাকে তখন তাঁর গৃহেই থাকতে বললেন। হেমগুপ্ত তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তাঁর স্বর্গত বন্ধুর এই পুত্রের সঙ্গে তাঁদের কন্যার বিবাহ দিলে কাজটি খুবই সুখের হবে। একে বন্ধুপুত্র তার ওপর বিত্তশালী ও গুণবান বন্ধুর পুত্রও পিতারই যোগ্য—এই ভেবে নয়নান্দের কাছে হেমগুপ্ত প্রস্তাব দিলেন তার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে। নয়নানন্দ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

নয়নানন্দ আর পদ্মাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হল ধুমধামের সঙ্গে। কিছুদিন পর নয়নানন্দ দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। বিদায়ের আগে হেমগুপ্ত জামাইকে প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন দিলেন, মেয়েকে মা গা ভর্তি গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন।

নয়নানন্দ স্ত্রীকে নিয়ে ইলাপুরে যাওয়ার পথে এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় পালকী থামিয়ে নয়নানন্দ স্ত্রীকে পালকী থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল তাকে, জায়গাটি খুব ভয়ঙ্কর, চোর ডাকাতের উপদ্রব এখানে খুব। পালকী-বাহকদের পালকী নিয়ে ফিরে যেতে বলে স্ত্রীকে বলল তার সব গহনাপত্র গা থেকে খুলে তাকে দিয়ে দিতে। পালকী বাহকেরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে নয়নানন্দ গহনাগুলিকে একটি পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে হেঁটে চলল। পথে একটি ইন্দারার মধ্যে হঠাৎ সে ধাক্কা দিয়ে স্ত্রীকে ফেলে দিল। কি তার দুর্বুদ্ধি। আর্তনাদ করে তার স্ত্রী কূপের মধ্যে পড়ে গেল। তারপরেই নয়নানন্দ ঊর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গল পেরিয়ে ইলাপুরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর সেই কূপের পাশ দিয়ে জনৈক ব্যক্তি যাওয়ার সময় কূপের মধ্য থেকে এক রমণীর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। সে শুকনো কূপের মধ্যে সাহসভরে নেমে পদ্মাবতীকে উদ্ধার করে ওপরে নিয়ে এল। পদ্মাবতী অক্ষত দেহেই ছিল, বিশেষ কোন আঘাত লাগে নি তার। পথিক তাকে ওপরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কিভাবে সে কূপের মধ্যে পড়ল। পদ্মাবতী ঘটনাটি ঘুরিয়ে বলল, সে আর তার স্বামী এই পথ ধরে চলেছিল; একদল ডাকাত এসে তার গা থেকে সব গহনা খুলে নেয় আর তার স্বামীর কাছ থেকে সব অর্থ ছিনিয়ে নেয়। তার স্বামীকে ডাকাতেরা উত্তমমধ্যম প্রহার করে তার সামনে। সে প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে তারা এই কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পথিক তার পরিচয় জেনে নিয়ে তাকে চন্দ্রপুরে তার পিতার গৃহে পৌঁছিয়ে দিল। চন্দ্রাবতীর পিতা পথিকটিকে কিছু পুরস্কার দিয়ে তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে হেমগুপ্ত জানতে পারলেন সেই দুর্ঘটনার কথা। পথিককে সে যা বলেছিল পিতাকেও তাই বলল। তার স্বামী দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে কিনা তাও জানে না বলল। পিতা কন্যাকে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই; ডাকাতেরা যখন জিনিসপত্র টাকাকড়ি সব পেয়েছে তখন তারা নয়নানন্দকে প্রাণে মারবে না বলে অভয় দিলেন কন্যাকে। জিনিসের জন্য দুঃখ করতে বারণ করলেন তিনি কন্যাকে। আর এক প্রস্থ গহনা বানিয়ে দিলেন তিনি কন্যার জন্য।

ইতিমধ্যে বিলাসব্যসনে থেকে নয়নানন্দের যখন সব টাকাকড়ি শেষ হয়ে গেল, গহনাগাটি সব বিক্রি করে নিঃশেষ হয়ে গেল যখন তার সব সহায়সম্বল, তখন সে ঠিক করল, শ্বশুরবাড়ীতে যাবে এবার। কোনো একটা ছল করে সেখানে গিয়ে উঠতে মনস্থ করল। চন্দ্রপুরে শ্বশুরবাড়ীতে এসে প্রথমেই তার সঙ্গে চন্দ্রাবতীর দেখা হয়ে গেল। চন্দ্রাবতী স্বামীকে বলল, 'তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ

নেই এখানে। প্রকৃত ঘটনা এরা জানে না। আমি বলেছি দস্যুরা আমাদের সবকিছু লুঠ করে তোমাকে উত্তমমধ্যম মেরেছে আর আমাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।' শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র নয়নানন্দ তাদের কাছে ফলাও করে ডাকাতির কথা বলল। শ্বশুর-শ্বাশুড়ি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যাক, তোমরা যে প্রাণে ফিরে এসেছে এইটাই না কত ভাগ্য। জিনিসের জন্য চিন্তা কর না, চন্দ্রাবতীর আর এক প্রস্থ গহনা গড়িয়ে দিয়েছি।'

শ্বশুরবাড়ীতে নয়নানন্দ সেদিন তোফায় থাকল। রাতে একই বিছানায় পদ্মাবতী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন নয়নানন্দ তার কোমর থেকে অস্ত্র বার করে পদ্মাবতীকে হত্যা করে তার সমস্ত অলঙ্কার গা থেকে খুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে গেল।

কাহিনীটি বিবৃত করে সারি বলল রাজা অনঙ্গসেনকে, 'আমি যা বললাম, তা আমি সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি ; কারোর কাছ থেকে শোনা কথা বলছি না, পুরুষেরা অতি ধূর্ত, নৃশংস, স্বেচ্ছাচারী ও ঘোর স্বার্থপর। এসব কারণে পুরুষের মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না করে।'

রাজা তা শুনে ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি এনে শুককে বললেন, 'ওহে শুক, এবার বল, তুমি কেন স্ত্রীজাতির ওপর এত বিরক্ত।'

তখন শুক বলল, মহারাজ শুনুন, আমিও এক কাহিনী বিবৃত করছি।

কাঞ্চনপুরের নগরের বণিক সাগরদত্তের শ্রীদত্ত নামে সুপুরুষ, গুণবান ও শান্তস্বভাবের এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরের অধিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিছুদিন পর শ্রীদত্ত বাণিজ্যব্যাপদেশে দেশে দেশ-দেশান্তরে যান। যে সময়টা তার বাইরে থাকার কথা ছিল তা পার হয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন কেটে গেল, কিন্তু তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। জয়শ্রী মনে মনে

চিন্তা করল স্বামী আর ঘরে ফিরে আসছে না, নিশ্চয়ই সে বিদেশে আর একটি বিবাহ করে সুখে জীবনযাপন করছে। জয়শ্রীও তার এক সাথীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এক পাত্রের সন্ধান পেল, তাকেই সে তার হৃদয় সঁপে দিয়ে ভাবল স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া হল।

এদিকে স্বামী দেশে ফিরে এসে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে দেখে জয়শ্রী আর তাকে চিনতেই পারছে না। শ্রীদত্ত জয়শ্রীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদয় আচরণ করেও তার মন যোগাতে পারলেন না। সে কেবলই তাকে নরাধম পাপিষ্ঠ বলে মুখ ঝামটা দিয়ে তার কাছ থেকে এড়িয়ে যায়। জয়শ্রীর মা-বাবাও তার এই ব্যবহার ভাল চোখে দেখছিলেন না। তারাও বুঝলেন স্বামীর সম্পর্কে সত্যিমিথ্যা না জেনেই তাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া মেয়ের পক্ষে ঠিক হচ্ছে না। শ্রীদত্তের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যজনক মনে হচ্ছিল।

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে জয়শ্রী বিছানা থেকে উঠেই শ্রীদত্তের চোখে ধূলো দিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল নির্জন পথ ধরে, তার নতুন বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে। এক চোর জয়শ্রীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানত। সে জয়শ্রীর বাড়ীর কাছাকাছি একটা কুটীরে থাকত। চোরটি জয়শ্রীর পিছু নিল। অন্ধকারের মধ্যে পিছন থেকে জয়শ্রীকে ধরে তার হাত-পা-মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে তাকে পাঁজাকোলা করে তাদের বাড়ীর রোয়াকে রেখে দিয়ে চলে গেল। পরদিন সকালে জয়শ্রীকে তার বাবা-মা তার হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে শিউরিয়ে উঠলেন। তাঁরা তার বাঁধন খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কে বা কারা তাকে এভাবে বেঁধে রেখে গেছে। জয়শ্রী বলল, তার স্বামী মাঝরাতে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বাড়ীর রোয়াকে বার করে দিয়ে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে দিয়েছিল। জয়শ্রীর বাবা-মা শ্রীদত্তের উপর এই ঘটনায় ভীষণ কুপিত হয়ে নগর-বিচারালয়ে জামাতার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন।

বিচারালয়ে পরদিন শ্রীদত্ত ও জয়শ্রীকে ডাকা হল। বিচারক জয়শ্রীর কাছে তার উপর শ্রীদত্তের নির্যাতনের কথা শুনে শ্রীদত্তের প্রতি কঠোর মনোভাব অবলম্বন করলেন। তবুও তিনি শ্রীদত্তকে তার বক্তব্য রাখার



সুযোগ দিলেন। শ্রীদত্ত বললেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না; মহামান্য বিচারক যে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি তাই মেনে নেবেন। বিচারক তখন শ্রীদত্তকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন। এতক্ষণ আড়াল থেকে চোর বিচারসভার কাজ লক্ষ্য করছিল।

এবারে সে এগিয়ে এসে বিচারককে বলল, 'আমি একজন চোর। ন্যায় বিচার চাই আপনার কাছে। জয়শ্রী নিজেই সে রাতে পালিয়ে যাচ্ছিল, আমিই তাকে পথে ধরে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে তাকে তাদের বাড়ীর রোয়াকে রেখে চলে যাই, যাতে সে পালাতে না পারে তার সহৃদয় ও আদর্শচরিত্র স্বামীর কাছ থেকে। বিচারক জয়শ্রীকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় জয়শ্রী নিরুত্তরা রইল। তখন বিচারক শ্রীদত্তের প্রতি অহেতুক অবিচার হওয়ায় লজ্জা প্রকাশ করলেন আর জয়শ্রীর মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর প্রদক্ষিণ করানোর জন্য নগরপালকে আদেশ দিলেন।

সারি কাহিনীটি শুনিয়া রাজা অনঙ্গসেনকে বলল, দেখলেন তো স্ত্রীলোক কিরকম বেইমান ও মিথ্যাচারিনী।

বেতাল শুক-সারির উপাখ্যানটি এভাবে শেষ করে রাজাকে বলল, এবারে বলুন তো মহারাজ, জয়শ্রী ও নয়নানন্দের মধ্যে কে বেশি দুরাত্মা। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, দুজনেই সমান পাপিষ্ঠ, কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না।

পঞ্চম উপাখ্যান

ধারা নগরের রাজা মহাবলের দূত হরিদাসের মহাদেবী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল।

একদিন মহারাজ দক্ষিণদেশে হরিদাসকে পাঠালেন তাঁর বন্ধু রাজা হরিশ্চন্দ্রের কুশল জানতে। হরিদাস তাঁর কন্যার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করছিলেন। এই সুযোগ দক্ষিণদেশে যদি কোন সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তিনি খোঁজ করে দেখবেন ঠিক করলেন।

দক্ষিণদেশে এসে তিনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁর বন্ধু রাজা মহাবলের দূত হরিদাসকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং কয়েকদিন তাকে তাঁর রাজ্যে থাকতে বললেন।

রাজা একদিন সভাগৃহে আলোচনা করছিলেন কলিকাল সম্পর্কে। তিনি হরিদাসকে জিজ্ঞেস করলেন কলিযুগ কি এখন শুরু হয়ে গিয়েছে। হরিদাস বললেন, 'হ্যাঁ, কলিকাল শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন দেখছেন না, মিথ্যার জয়, আর সত্যের পরাজয় ঘটছে; ধর্মের অবলুপ্তি আর অধর্মের প্রকোপ লক্ষ্য করছেন না—এখনকার মানুষের জীবনে।' তাঁদের আলোচনার ফাঁকে রাজার এক বিশেষ পরিচিত

ব্রাহ্মণ তাঁর ছেলেকে নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে রাজার শাসনদপ্তরে ছেলের একটি কাজের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে নিলেন। রাজা হরিদাসের কাছে ছেলেটির প্রশংসা করে বললেন, ওর একটা অসাধারণ গুণ আছে, এমন অদ্ভুত রথ তৈরি করতে পারে, যার গতিবেগ বাতাসের মত। হরিদাস তার মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলের সম্বন্ধ পাড়ল—এমন গুণবান ছেলেকে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। রাজাও সম্বন্ধটির ব্যাপারে উৎসাহী হলেন। ব্রাহ্মণ এই বিবাহ-প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

হরিদাস তার ভাবী জামাতাকে নিয়ে ধারা নগরে ফিরে এলেন। তিনি ঘরে এসে দেখেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্র মহাদেবীর জন্য দুজন পাত্রকে বাড়ীতে এনেছেন। মহা সংকটে পড়লেন হরিদাস, তিনি তিনজনকেই একদিন অপেক্ষা করতে বললেন, তিনজনেই অধীর হয়ে পড়ল, প্রত্যেকেই ভাবছে ব্রাহ্মণকন্যা মহাদেবীর উপযুক্ত সে।

পরদিন ভোরবেলায় হরিদাস ও তার বাড়ীর লোকেরা দেখলেন মহাদেবী অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারিদিকে খোঁজ করা হল, কিন্তু কোথাও তার হদিশ পাওয়া গেল না। তখন দ্বিতীয় পাত্র বলল, 'আমি গণনা করে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলতে পারি। মহাদেবী কোথায় আছে তা গণনা করে বলে দিচ্ছি।' তৃতীয় পাত্র বলল, 'যদি তার সন্ধান পাওয়া যায়, তার অপহরণকারীকে আমি ধনুকে গুণ দিয়ে বধ করতে পারব, যত দুর্ধর্ষই হোক না সে।' প্রথম পাত্র তা শুনে বলল, 'মহাদেবীকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক, যত দুর্গমই হোক সে স্থান, আমি সেখানে নিমেষে রথ ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

দ্বিতীয় পাত্র গণনা করে বলল, বিন্ধ্যপর্বত নিবাসী এক রাক্ষস মহাদেবীকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনজনেই প্রথম পাত্রের বিদ্যুৎগতি রথে চড়ে বিন্ধ্যপর্বতের কাছে এসে রাক্ষসটিকে দেখতে পেল। তৃতীয় পাত্র রাক্ষসটিকে নিশানা করে

মুহূর্তে ধনুকে গুণ দিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। রাক্ষস তীরবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল সঙ্গে সঙ্গে। তারা তিনজনে তখন পাহাড়ের গুহা থেকে মহাদেবীকে উদ্ধার করে নিয়ে এল রথে আরোহণ করে। কন্যাকে ফিরে পেয়ে হরিদাস আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তাদের তিনজনের কাছেই অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি।

কাহিনীটি এখানেই শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের মধ্যে কাকে তুমি মহাদেবীর উপযুক্ত পাত্র বলে মনে কর।' রাজা উত্তর দিলেন, 'তিনজনের সম্মিলিত প্রয়াসেই মহাদেবীর উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। কারোরই কৃতিত্ব কারোর থেকে বিশেষ কম-বেশি নয়। তবে আমার মনে হয়, তৃতীয় পাত্রই সর্বাধিক উপযুক্ত মহাদেবীর পক্ষে। কেননা, রাক্ষসের সন্ধান পাওয়া বা রাক্ষসের আবাসস্থলে পৌঁছোলেই তো মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হত না, রাক্ষসকে বধ করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।'

ষষ্ঠ উপাখ্যান

একদিন এক তন্তুবায় তার এক বন্ধুর সঙ্গে ধর্মপুর নগরে রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছিল। এক গৃহের আঙ্গিনায় এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় তাঁতি। এইরকম একটি সুন্দরী মেয়েকে যদি পত্নীরূপে পেত সে মনে মনে ভাবতে ভাবতে বন্ধুর সঙ্গে এগিয়ে চলল, পথে ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দির পড়ল। তন্তুবায় জানত এই কাত্যায়নীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবীর পূজার্চনা করে তাদের রাজা ধর্মপাল পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। একথা ভেবেই সে কাত্যায়নীর মন্দিরে ঢুকে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মানত করল দেবী যদি ঐ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে তিনি তার মস্তকচ্ছেদন করে দেবীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবেন।

বাড়ীতে এসে তাঁতিটি কেবলই সেই মেয়েটির কথা চিন্তা করে। চিন্তায় চিন্তায় সে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া নিদ্রা সব ভুলে গেল। তখন তার পিতা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন পুত্রের এই রুগ্ন চেহারা ও নিদারুণ অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে। তিনি পুত্রের

কাছে জিজ্ঞেস করেও এর কারণ জানতে পারলেন না। তাঁতির বন্ধুটি তার এই মানসিক অবস্থা বুঝে তার পিতাকে ঘটনাটির কথা বলল। তা শুনে তাঁতির পিতা মেয়েটির খোঁজখবর নিয়ে তাদের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন একদিন। মেয়েটির পিতার সঙ্গে দেখা করে বললেন, তিনি তাঁর কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছেন। গৃহস্বামী তাঁকে কথা দিলেন যে যদি সাধ্যাতীত না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। তখন তাঁতির পিতা গৃহস্বামীর কাছে নিজের পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। গৃহস্বামী ভাবী বেয়াইয়ের পরিবার ও তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। যথাসময়ে তাঁতির সঙ্গে সেই অসামান্যা সুন্দরীটির বিবাহ হয়ে গেল।

বেশ সুখেই তাদের দাম্পত্য জীবন কাটছিল। একদিন একটি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্ত্রী ও সেই বন্ধুটির সঙ্গে তাঁতি শ্বশুর-বাড়ীতে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথে কাত্যায়নীর মন্দিরটি তার নজরে পড়ল। মন্দিরটি দেখেই বিবেকের দংশন হতে লাগল তার। কাত্যায়নীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে সে এতদিন আপন সুখেই বিভোর ছিল, একথা ভেবেই স্ত্রী ও বন্ধুকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেবী কাত্যায়নীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে খড়্গ দিয়ে অবিচলভাবে নিজের শিরোশ্ছেদন করল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁতিকে মন্দির থেকে ফিরতে না দেখে তার বন্ধু মন্দিরে ঢুকে দেখে তাঁতির দ্বিখণ্ডিত দেহ দেবীর সামনে পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে বুঝল সে, বন্ধুর মানত পূর্ণ হল ; ভাবল সে, এখন যদি সে এখান থেকে চলে যায়, তাহলে লোকে ভাববে বন্ধুর সুন্দরী পত্নীর প্রতি অনুরাগ বশতই সে তাঁতিকে খুন করেছে। তখন সে খড়্গ তুলে নিজের মস্তকচ্ছেদন করল তাঁতিরই মত। তাদের দুজনকেই অনেকক্ষণ মন্দির থেকে ফিরতে না দেখে তাঁতির স্ত্রী মন্দিরে ঢুকে

দুজনের দ্বিখণ্ডিত দেহ দেখে আঁৎকিয়ে উঠল। সে মনে মনে চিন্তা করল, এখন যদি সে মন্দির পরিত্যাগ করে চলে যায়, লোকে তাকে অসচ্চরিত্রা বলে জানবে, লোকের ভুল ধারণা হবে যে তার জন্যেই দুই বন্ধু মারামারি করে মরেছে; তাছাড়া সারাজীবনের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে, এসব চিন্তা থেকেই সেও খড়্গ তুলে নিজের গলায় কোপ দিতে গেল, দেবী এদৃশ্য দেখে করুণার্দ্র হয়ে তার সামনে সশরীরে আবির্ভূতা হয়ে তার হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত করে বললেন যে তার সাহস ও সদ্বিবেচনার জন্য প্রসন্ন হয়েছেন তিনি তার প্রতি এবং তার প্রত্যাশিত বর পূর্ণ করবেন তিনি, বললেন তাকে। তাঁতিপত্নী তখন দেবীর কাছে স্বভাবতই স্বামী ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণভিক্ষা চাইলেন।

দেবী কাত্যায়নী তখন তাঁতিপত্নীকে দুজনের ধড়ের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ মাথা যুক্ত করতে বলে অন্তর্হিত হলেন। তাঁতিপত্নী আনন্দের আতিশয্যে একের মাথা অপরের ধড়ের সঙ্গে যুক্ত করে দিল, দুটি ধড়ের নিজ নিজ মস্তক বদলা-বদলি হয়ে গেল, তাঁতিপত্নীর তড়িঘড়ির জন্য।

কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন মহারাজ বলুন তো, ঐ কন্যা তার স্বামীকে কি করে চিনবে, ধড় ও মাথা তো পাল্টাপাল্টি হয়ে গেল।' তখন রাজা উত্তর দিলেন, নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, পর্বতের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু শ্রেষ্ঠ, মানুষের শরীরের মধ্যে মস্তক শ্রেষ্ঠ; রমণীটির স্বামীর মস্তক তো ঠিকই আছে, অন্য ধড়ে যুক্ত হলেও সেইটিই উত্তমাঙ্গ, স্বামীর মস্তকযুক্ত অন্যের ধড়টিই তার স্বামী হিসাবে চিহ্নিত হবে।

সপ্তম উপাখ্যান

চম্পক নগরের রাজা চন্দ্রাপীরের ত্রিভুবনসুন্দরী নামে পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। সে বিবাহযোগ্যা হলে, রূপে গুণে অদ্বিতীয়া এই রাজকন্যার জন্য দেশ-বিদেশের রাজাদের কাছ থেকে বিবাহের সম্বন্ধের প্রস্তাব আসতে লাগল প্রতিদিন। তাঁরা বিখ্যাত সব শিল্পীদের দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিমূর্তি আঁকিয়ে সেসব চিত্র রাজা চন্দ্রাপীরের কাছে পাঠাতে লাগলেন তাঁর কন্যার পছন্দের জন্য। কিন্তু রাজকুমারী কাউকেই পছন্দ করেন না, শেষে রাজা তার জন্য সয়ংবর সভার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাবে অরাজী হলেন রাজকন্যা। তাঁর ইচ্ছা, এমন ব্যক্তিকে বিবাহ করবে, যে বিদ্যা বুদ্ধি ও বিক্রমে অদ্বিতীয়।

একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার পরে দেশান্তর থেকে চারজন পাত্র এসে উপস্থিত হল রাজা চন্দ্রাপীরের কাছে। প্রথমজন রাজাকে বলল, সে প্রতিদিন একটি বস্ত্র প্রস্তুত করে পাঁচ রত্ন মূল্যে বিক্রয় করে। তার মধ্যে এক রত্ন ব্রাহ্মণকে দান করে সে, দ্বিতীয় রত্ন দেবতার উদ্দেশে দান করে, তৃতীয় রত্ন অঙ্গে ধারণ করে, চতুর্থ রত্ন

ভাবী স্ত্রীর জন্য পৃথক করে রাখে, আর পঞ্চম রত্ন দিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহ করে—একথা রাজাকে জানিয়ে বলল সে, এই গুণ অন্য কারোরই থাকতে পারে না। দ্বিতীয় পাত্র বলল, সে স্থলচর জলচর সকল পাখির ভাষা জানে, তার সমান বলবান পুরুষ আর কেউই নেই বলে দাবি করল সে। তৃতীয়জন বলল যে সে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। চতুর্থজন বলল, সে অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করতে সুপটু সে।

রাজা চারজনের গুণের বর্ণনা দিয়ে কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে সে পতিরূপে বরণ করতে চায়। কন্যা লজ্জায় আরক্তিম ও নিরুত্তরা হয়ে রইলেন।

এই পর্যন্ত বলেই বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, এই চারজনের মধ্যে কার ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হওয়ার যোগ্যতা আছে। রাজা উত্তর দিলেন, যে দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করে সে জাতিতে শূদ্র, যে ব্যক্তি পশুপক্ষীর ভাষা বোঝে, সে জাতিতে বৈশ্য, যে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, সে হল ব্রাহ্মণ, কিন্তু শব্দভেদী শর নিক্ষেপকারী পুরুষটি কন্যার স্বজাতীয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, সামাজিক রীতি অনুসারে সেই ত্রিভুবনসুন্দরীকে বিবাহ করতে পারে।

অষ্টম উপাখ্যান

মিথিলানগরের রাজা গুণাধিপের কাছে কর্মলাভের আশায় দক্ষিণ-দেশীয় এক রজক তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়। কিন্তু রাজকার্যে রাজার মন ছিল না তখন। তিনি অন্দরমহলেই আলস্যে জীবনযাপন করছিলেন সেসময়। বাইরের অমাত্য, রাজকর্মচারী, সাক্ষাৎপ্রার্থী কারোর সঙ্গেই তিনি দেখা করছিলেন না। রজক প্রায় এক বছর অপেক্ষা করেও রাজার সাক্ষাৎলাভ করতে পারল না। ফলে এই এক বছর নিজের থাকা খাওয়ার ব্যয় মেটাতে গিয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়ল। এই উপলব্ধি ছিল তাঁর, আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু তার কাছে আশাই কাল হল। সে মন থেকে সব আশা মুছে দিয়ে উর্দ্ধজীবন বরণ করার জন্য গভীর জঙ্গলে গিয়ে একটি ছোট কুটীর তৈরী করে সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে শুরু করল।

এর কিছুদিন পর রাজা গুণাধিপ রাজকার্যে পুনরায় মন দিলেন। তিনি একদিন একাকী মৃগয়া অভিযানে বেরিয়ে গভীর জঙ্গলে এসে পড়লেন। সেই সময় সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে ধীরে ধীরে অন্তর্ধান করলেন। গভীর অন্ধকার নেমে এল সেই নিবিড় জঙ্গলে। পথ

হারিয়ে রাজা জঙ্গলের মধ্যে এক কুটীরের কাছে এসে পড়লেন। ভয়-আতঙ্ক আর ক্ষুৎপিপাসা তাকে চলচ্ছক্তিহীন করে তুলেছিল। কুটীরে তিনি এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে পিপাসা নিবারণে জল চাইলেন। সন্ন্যাসী আগন্তুককে সাদরে বসিয়ে কিছু সুমিষ্ট ফল ও সুপেয় জল দিয়ে তাকে আন্তরিকভাবে যত্নআত্তি করে পরিতৃপ্ত করলেন। সন্ন্যাসী এই আগন্তুককে তাঁর কুটীরেই আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। রাজা সন্ন্যাসীকে বললেন যে সন্ন্যাসধর্ম পালন করলেও তাঁকে দেখে মনে হয় সংসারধর্মে তাঁর অনাসক্তি নেই। সন্ন্যাসী তখন আগন্তুককে বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন নি। তিনি তার পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি একজন রজক, নাম তাঁর চিরঞ্জীব, মিথিলানগরের রাজা গুণাধিপের কাছে তিনি কর্মলাভের আশায় গিয়েছিলেন, কিন্তু বছরখানেক অপেক্ষা করেও রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি, তাই সংসারের-জগতের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই সাধুসন্তের জীবন কাটাচ্ছেন। রাজা তা শুনে খুবই লজ্জিত হলেন তাঁর কাছে। রাজা তখন নিজের পরিচয় দিলেন এবং চিরঞ্জীবকে তাঁর রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করবেন।

একবার রাজকার্য উপলক্ষে চিরঞ্জীবকে রাজা দেশান্তরে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে রাজকার্য সেরে এক দেবালয়ে পূজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন, এক অসামান্যা সুন্দরী তাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। সুন্দরীটির সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে খিলখিল করে হেসে মন্দিরের আশেপাশে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। চিরঞ্জীব মিথিলানগরে ফিরে রাজার কাছে সুন্দরী মেয়েটির কথা বলল। রাজা তা শুনে চিরঞ্জীবকে নিয়ে দূর রাজ্যের সেই মন্দিরটিতে পূজা দিতে গেলেন। মন্দিরের পাশেই ঘুরতে দেখলেন তাঁরা সেই সুন্দরীটিকে। সুন্দরীটি এগিয়ে এসে রাজার সঙ্গে মিষ্টিসুরে কথা বলতে আরম্ভ করল। তার কাছে রাজা জানলেন, সেই মন্দিরেরই এক সেবাইত সে। রাজা জিজ্ঞেস

করলেন বিবাহ করতে সে ইচ্ছুক কিনা। সে রাজার কাছে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। সুন্দরীটি ভেবেছিল, রাজাই তাকে বিবাহ করতে চাইছেন, মনে মনে সে বেশ পুলকিত হল। রাজা তাকে বললেন, 'আমার এই বন্ধুকে বিবাহ করতে হবে তোমাকে।' মেয়েটির মুখ এবারে গম্ভীর হয়ে গেল। তখন রাজা তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি মিথিলানগরের রাজা আর এই ব্যক্তি তাঁর বিশেষ বন্ধু। রাজা তাঁর অভিপ্রায় জানালেন, সে তাঁর বন্ধুকেই যেন বিবাহ করে। তখন রাজার কথার অমর্যাদা করতে পারল না সে।

এই পর্যন্ত বলেই বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশি সৌজন্য ও ঔদার্যের পরিচয় দিলেন। বিক্রমাদিত্য চিরঞ্জীবকেই মহত্তর বললেন। রাজা শেষে চিরঞ্জীবের উপকার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু চিরঞ্জীব রাজার পরিচয় না জেনেও তাঁর চরম বিপদের সময় যেভাবে সেবা করে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন তার সাথে রাজার উপকারের তুলনা চলে না বললেন তিনি।

নবম উপাখ্যান

মগধপুরের বিত্তশালী বণিক বীরবরের সুন্দরী কন্যা মদনসেনের বিবাহের আর পাঁচদিন বাকি ছিল। প্রকৃতিতে বসন্তঋতুর উৎসব চলেছে তখন, মদনসেনা সেদিন সখীদের নিয়ে উপবনে বিহার করতে গিয়েছিলেন। ধর্মদত্ত বণিকের পুত্র সোমদত্তও তার বন্ধুদের সঙ্গে ইতস্তত ঘুরছিলেন ঐ উপবনে সেই সময়ে। মদনসেনার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে সোমদত্ত মদনসেনার সখী মারফত তার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলার সম্মতি নিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করলেন তাঁর কাছে। নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথম দর্শনেই মদনসেনার প্রতি তাঁর যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে তা প্রকাশ করলেন তাঁর কাছে এবং তিনি তাঁর কাছে এই অভিপ্রায় জানালেন সে যদি তাকে বিবাহ করতে সম্মত হন তিনি, তবেই এ জীবন রাখবেন তিনি। মদনসেনা তাঁকে খুলে বললেন যে তার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে। আর পাঁচদিন মাত্র বাকি, সুতরাং তার অন্যত্র বিবাহের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু সোমদত্তের অশেষ পীড়াপীড়িতে মদনসেনা তাঁকে একটি কথা দিলেন যে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে প্রথম দিনই দেখা করবেন তিনি তাঁর সঙ্গে।

বিয়ের পর মদনসেনা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে প্রথম রাতেই স্বামীকে খোলাখুলি সোমদত্তের প্রসঙ্গটি পেড়ে বললেন যে তিনি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে শ্বশুরবাড়ীতে এসে প্রথম দিনই দেখা করবেন তাঁর সঙ্গে। স্বামী তাঁকে অশেষ তিরস্কার করে বললেন এত রাতে পরপুরুষের কাছে যাওয়া গর্হিত ব্যাপার। মদনসেনা তখন বললেন, রাতে যাওয়ার উদ্দেশ্য, কাকপক্ষীও এই ঘটনার কথা জানতে পারবে না। শেষে তাঁর স্বামী প্রতিজ্ঞাপালনে তাঁকে আর নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরা অবস্থায় মদনসেনা গভীর রাতে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন সোমদত্তের গৃহের উদ্দেশে। পথে এক তস্কর গাভর্তি গহনা পরা এই গৃহবধূকে দেখতে পেয়ে তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, 'কে তুমি নারী এই গভীর রাতে অন্ধকার পথে একাকী কোথায় চলেছ।' উত্তর দিল মদনসেনা, 'আমি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বণিক সোমদত্তের কাছে যাচ্ছি।' চোর তখন তাঁকে তার গহনাগাটি সব খুলে দিতে বলল। তিনি তখন চোরকে বললেন, 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি সোমদত্তের সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে ফিরব, তখন তোমাকে আমার সব অলঙ্কার খুলে দেব, অঙ্গীকার করছি।' চোর তাঁর কথার অকপট ভঙ্গী দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এবং তার কথাতে বিশ্বাস করে অপেক্ষা করে থাকল সেখানে।

মদনসেনা সোমদত্তের কাছে গিয়ে বললেন, তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাঁর কাছে এসেছেন। সোমদত্ত তাঁকে বললেন, 'তুমি এখন পরস্ত্রী, আমার কাছে এসেছ জানতে পারলে লোকে তোমার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করবে। তুমি এখুনই স্বামীর কাছে ফিরে যাও।' মদনসেনা নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে চললেন তখুনই সেই গভীর রাতে। পথে চোরকে একই জায়গায় দাঁড়ানো দেখে তিনি তার অলঙ্কারগুলো খোলার উদ্যোগ করলেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে। কিন্তু চোর তাঁকে বাধা দিয়ে বলল:

তাঁর অলঙ্কারে তার কোন লোভ নেই। চোর তাকে বলল, তাঁর মত সত্যবাদিনী ও সরল প্রকৃতির নারীর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই তার। নির্ভয়ে চলে যেতে বলল তাঁকে। মদনসেনা শ্বশুরবাড়ীতে সবার অলক্ষ্যে ঐ রাতে ফিরে এসে স্বামীকে তার অভিযানের বিষয়টি অকপটে বললেন।

এই পর্যন্ত বলে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, এই চারজনের মধ্যে কার ঔদার্য বেশি। রাজা উত্তর দিলেন, চোরের ঔদার্যই বেশি। তিনি বললেন, মদনসেনার স্বামী খোলা মনে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তাঁর স্ত্রী মদনসেনাকে সোমদত্তের কাছে যেতে দিতে সম্মত হয় নি। সোমদত্ত মদনসেনাকে বিবাহের আশায় অহেতুক অধৈর্য প্রকাশ করেছিলেন এবং রাজদণ্ডের ভয়ে তাঁকে পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করতে পারলেন না; মদনসেনা প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীলোকের কাছে পবিত্র যে সম্পদ তা হল সতীত্ব, মদনসেনার সতীত্ব নিয়ে যে প্রশ্ন উঠতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন, প্রতিজ্ঞাপালনই বড় হল তার কাছে। কিন্তু চোর, রাজা বললেন, মহামূল্য অলঙ্কার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মদনসেনার প্রতিজ্ঞা-পালনের কথা শুনে লোভ সংবরণ করে তাঁকে অক্ষত দেহে ছেড়ে দিয়ে অসীম ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছিল।

দশম উপাখ্যান

গৌড়দেশে অবস্থিত বর্ধমান নগরের রাজা গুণশেখরের মন্ত্রী অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরই উপদেশ ও মন্ত্রণাদানে রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যময় শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে প্রজাদের আদেশ দিলেন যে তাঁর রাজ্যে যেন কেউ হিন্দু ধর্মাচার পালন না করে।

মন্ত্রী অভয়চন্দ্র দেশজুড়ে এই ঘোষণা করে দিলেন যদি কেউ রাজার নির্দেশের বিরোধিতা ক'রে এইসব অনুষ্ঠান পালন করে তাহলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে। প্রজারা কুলপরম্পরায় পালিত এই আচার-অনুষ্ঠান বাতিল করে দিতে আন্তরিকভাবে অনিচ্ছুক ছিল কিন্তু রাজদণ্ডের ভয়ে প্রকাশ্যে এইসব অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হল।

অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মের মর্ম রাজ্যের মানুষদের কাছে তুলে ধরলেন। বৌদ্ধধর্মের মর্মবস্তু সম্বন্ধে তিনি যা বললেন তা হল এজন্মে কারোর প্রাণবধ করলে নিহত ব্যক্তি পরজন্মে ঘাতকের প্রাণনাশ ক'রে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থতা করে। একারণেই অহিংসা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ছোটবড় নির্বিশেষে জীবজগতের সকল প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ম ও পবিত্র ধর্ম। মানুষেরা তাদের রসনাতৃপ্তির জন্য মাংস ভক্ষণ ক'রে চরম অধর্মের কাজ করে এবং তাদের এই

পাপের জন্য তাদের স্থান হয় নরকে। সুতরাং জীবহিংসা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

রাজা গুণশেখরের অকাল মৃত্যু হলে তাঁর তরুণ পুত্র ধর্মধ্বজ বর্ধমানের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যময় ধর্মের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। রাজ্যে এক আদেশ জারী করে প্রজাদের আবার হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে বললেন। আপন ধর্মাচরণের সুযোগ পেয়ে প্রজারা ধর্মধ্বজকে সাধুবাদ জানাল। পিতার আমলের একটি অন্যায়ের প্রতিবিধান পুত্রের হাতে হতে দেখে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ধর্মধ্বজ মন্ত্রী অভয়চন্দ্রকে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। অভয়চন্দ্র বললেন, তিনি মৃত্যুকে বরণ করবেন, তবু বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করবেন না। ধর্মধ্বজ তখন অভয়চন্দ্রকে মন্ত্রীপদ থেকে বরখাস্ত করে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করলেন।

আখ্যানটি শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মধ্বজ আর অভয়চন্দ্র, এই দুজনের মধ্যে কে বেশি ধর্মপ্রাণ। রাজা উত্তর দিলেন, অভয়চন্দ্রই বেশি ধর্মপ্রাণ। কারণস্বরূপ তিনি বললেন, ধর্মধ্বজ তার পিতার আমলে চাপানো বৌদ্ধধর্ম পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে প্রজাদের মুক্তি দিয়ে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করার চিরাচরিত অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এই কাজে তার নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয় ঠিকই; কিন্তু অভয়চন্দ্রকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত করায় তিনি অধর্মের কাজই করেছেন। রাজা গুণশেখরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করতে অভয়চন্দ্র কোন শক্তির আশ্রয় নেন নি; তিনি তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস দিয়ে রাজাকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তাছাড়া অভয়চন্দ্র আপন ধর্মের স্বার্থে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন।

একাদশ উপাখ্যান

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের উপর রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করে কিছুদিনের জন্য রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে লাগলেন পুণ্যপুরের রাজা বল্লভ। নিভৃত রাজকার্য নির্বাহ ও নীতিশাস্ত্র চর্চা করতে করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সত্যপ্রকাশ।

সত্যপ্রকাশের পত্নী তাঁকে সর্বদাই চিন্তিত ও ক্রমশ কৃশ হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেন তাঁকে কেন তিনি এমন হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। সত্যপ্রকাশ উত্তর দেন স্ত্রীকে, রাজা সমস্ত রাজ্যভার তার দায়িত্বে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রামসুখে মগ্ন রয়েছেন। দায়িত্ব ও চিন্তার বোঝায় তিনি একমুহূর্ত শান্তি পাচ্ছেন না। স্ত্রীর পরামর্শে তিনি রাজার কাছে রাজ্যের দায়িত্বভার থেকে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি লাভে সম্মতি নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন দেশে দেশে। নানা তীর্থ দর্শন করে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। সেখানে তিনি রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিয়ে বাইরে এসে সমুদ্রের মধ্যে এক অলৌকিক দৃশ্য দেখলেন। সমুদ্রগর্ভ থেকে এক মহীরুহ জেগে উঠল; সেই মহীরুহের শাখায় এক পরমা সুন্দরী রমণী তার হাতের

বীণায় ঝঙ্কার তুলে এক স্বর্গীয় মূর্ছনার সঞ্চার করে চলেছে। সত্যপ্রকাশ বিস্ময়াভিভূত হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। সহসা রমণীটিকে নিয়ে মহীরুহটি আবার সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেল।



তীর্থভ্রমণ করে পুণ্যপুরে ফিরে এসে রাজার সঙ্গে দেখা করে সেই অলৌকিক দৃশ্যটির কথা বললেন তিনি। রাজা তা শুনে চমৎকৃত

হয়ে সত্যপ্রকাশের হাতে আবার রাজ্যভার দিয়ে রামেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন কালবিলম্ব না করে।

রামেশ্বরে পৌঁছে মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিয়ে সমুদ্রের তীরে এসে সত্যপ্রকাশ বর্ণিত সেই আলৌকিক দৃশ্য চাক্ষুস দেখলেন তিনি। সমুদ্র থেকে উত্থিত মহীরুহের শাখায় বসে বীণাবাদনরত সুন্দরী রমণীটির কাছে যাওয়ার জন্য সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিলেন রাজা। বীণাবাদনরত রমণীটির সঙ্গে রাজাকে নিয়ে সেই মহীরুহ জলের তলদেশে পাতাল পুরীতে এসে পৌঁছোল। পাতালপুরীতে এসে সেই রমণীটি রাজাকে বলল, 'তুমি কে? কেনই বা এই দুঃসাহসিক কাজ করলে? এখানে এসে বিপদ ডেকে নিয়ে এলে কেন?' রাজা তাঁর পরিচয় দিলেন, পুণ্যপুরের রাজা তিনি, নাম তাঁর বল্লভ। রাজা বললেন তাকে, তার সৌন্দর্য ও সঙ্গীতপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে এসেছেন তিনি এখানে। রমণীটিকে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলেন যে সে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবে। সুন্দরীটি তখন বলল তাঁর সঙ্গে বিবাহ সম্ভব হতে পারে, যদি তিনি প্রতি কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন তার সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখেন। রাজা সম্মত হলেন। গান্ধর্বমতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলেন তিনি সুন্দরীটিকে।

কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন রাজার কৌতূহল প্রবল হল। কেন তার সুন্দরী পত্নী ঐদিন তার মুখদর্শন করতে নিষেধ করেছিল, এই রহস্য-ভেদ করার জন্য ঐদিন তিনি অলক্ষ্যে থেকে প্রকৃত ব্যাপার কি জানার অপেক্ষায় থাকলেন।

চতুর্দশীর দিন রাজা অতন্দ্র চোখ রাতে জেগে গোপনস্থান থেকে তাঁর পত্নীর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। আকস্মিক মাঝরাতে দেখলেন, এক রাক্ষস এসে সুন্দরীটিকে প্রহার করতে শুরু করল, আর সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করল। তখন রাজা তার তরোয়াল উঁচিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাক্ষসকে অভিসম্পাত করতে করতে এক কোপে তার শিরশ্ছেদন করলেন। তখন তাঁর সেই

সুন্দরী পত্নী ছুটে এসে তাঁর কাছে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, 'আজ কতদিন ধরে এই রাক্ষসের হাতে কি নিদারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছি। তুমি আজ আমার সব যন্ত্রণার অবসান ঘটালে।' রাজা তখন জানতে চাইলেন তার কাছে, এতদিন ধরে তাকে এই বিষম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল কেন। সে তখন তার জীবনের পূর্বকথা রাজাকে শোনাল।

গন্ধর্বরাজ বিদ্যাধরের কন্যা রত্নমঞ্জরী—নিজের এই পরিচয় দিয়ে রাজাকে বলল সে, 'একবার গৃহকার্যে অবহেলা করার জন্য আমার পিতার মধ্যাহ্নের ভোজনপর্ব সমাধা হতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। পিতা ক্ষুধায় অধৈর্য হয়ে গিয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তুই রসাতল-বাসিনী হবি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এক রাক্ষস এসে তোকে অশেষ যন্ত্রণা দেবে। এই অভিশাপের কথা শুনে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি, কাঁদতে কাঁদতে আমি পিতাকে বলি, কিভাবে আমার শাপ মোচন হবে।' তখন পিতা কিছুটা নরম হয়ে বললেন, 'এক মহাবল বীরপুরুষ এসে সেই রাক্ষসকে নিধন করে তোকে উদ্ধার করবে।' এই কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গন্ধর্বকন্যাটি রাজাকে বললেন, 'তুমি আমাকে একবার আমার পিত্রালয়ে নিয়ে চল। পিতার সাক্ষাৎলাভের জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে আছে।' রাজা বললেন তাকে, যদি তাঁর উপকারের মর্যাদা যদি সে দিতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজধানীতে যেতে হবে। রত্নমঞ্জরী স্বামীর সঙ্গে প্রথমে তাঁর রাজধানীতে যেতে আর অসম্মতি প্রকাশ করতে পারল না। রাজা বল্লভের সঙ্গে কিছুদিন দাম্পত্যজীবন উপভোগ করার পর রত্ন-মঞ্জরী পিত্রালয়ে যেতে চাইলেন। রাজা এবারে তাকে মুক্তহৃদয়ে সম্মতি দিলেন। কিন্তু রত্নমঞ্জরী তারপর কিছু চিন্তা করে বুঝলেন যে পিত্রালয়ে যাওয়া তার কোনদিনই ঠিক হবে না। রাজাকে বললে তি[redacted]জীবন কাটালাম, আমার গন্ধর্বত্ব নাশ হয়েছে পিতা আমার সর্বগন্ধর্বপতি। তাঁর কাছে গিয়ে এখন আর কোন সমাদর পাব না। আজীবন আমি তোমার কাছেই জীবন অতিবাহিত

করব।' রাজা পরম আনন্দিত মনে রত্নমঞ্জরীকে নিয়ে সবকিছু ভুলে গিয়ে রাজকার্য জলাঞ্জলি দিয়ে, বিলাসব্যসনে জীবন কাটাতে লাগলেন অন্ধের মতো। তাই দেখে অমাত্য সত্যপ্রকাশ রাজা এবং রাজ্যের চিন্তায় চিন্তায় প্রাণত্যাগ করলেন।

বিক্রমাদিত্যকে কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, 'বলুন মহারাজ, অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করল কেন।' রাজা উত্তর দিলেন, 'মন্ত্রী দেখলেন, রাজা রাজকার্য ছেড়ে অন্দরমহলেই জীবন কাটাচ্ছেন, ফলে রাজা জীবিত থাকতেও প্রজারা অনাথ হয়ে গেল ; প্রজারা তাকে আর মান্য করবে না, গাছের যে গোড়ার জন্য ডাল গজায়, সেই গুঁড়িতেই যদি ঘুণ ধরে যায় তবে ডালেরই বা আয়ু আর কতটুকু তাই তিনি আত্মবিসর্জন ছাড়া আর কোন পথই দেখলেন না।'

দ্বাদশ উপাখ্যান

চূড়াপুরের দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের পত্নীবিয়োগ হলে সংসারধর্মে তাঁর বৈরাগ্য জন্মায়। গৈরিক বসন পরে ভিক্ষালব্ধ অন্নে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতে শুরু করলেন তিনি।

একদিন মধ্যাহ্নে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অন্নের আশায় ধর্না দিলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভিখারী বৈরাগীটির ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণে এক পাত্র দুধ এনে দিলেন তাকে। গ্রহবৈগুণ্যে এক বিষধর সাপ ঐ দুধে মুখ দিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে। বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই দুধ। দেবস্বামী তা পান করে সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে পড়ে যান, তাঁর সর্বাঙ্গ সাপের বিষে নীল হয়ে যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন তিনি। প্রাণত্যাগ করার আগের মুহূর্তে ব্রাহ্মণ গৃহস্বামীকে আর্তনাদ করে বলেন, 'তুমি বিষপ্রয়োগে ব্রহ্মহত্যা করলে।' ব্রাহ্মণ আতঙ্কগ্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে পড়লেন। একটু পরেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই দুধে বিষ মিশিয়েছ। তুমি পিশাচিনী, তোমার মুখ আর দর্শন করব না। চরম ক্রোধভরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

এই পর্যন্ত বলে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ঘটনার জন্য কে দোষভাগী হবে। রাজা উত্তর দিলেন, সাপের মুখে বিষ থাকে, স্বভাবতই সে দোষী হতে পারে না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সেই দুধকে বিষাক্ত বলে জানতেন না, সুতরাং ব্রহ্মহত্যার জন্য তাঁরা দোষভাগী হবেন না। আর অতিথি ব্রাহ্মণ না জেনেই বিষাক্ত দুধ পান করলেন, স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হন নি তিনি, তাই তাঁর দোষও নেই ; কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বিস্তারিত অনুসন্ধান না করে সহধর্মিণীর প্রতি নিষ্ঠুরতম আচরণ করলেন, ঘর থেকে বহিষ্কার করলেন তাঁকে ; অকারণে পত্নী পরিত্যাগে তিনিই দোষভাগী হবেন।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

চন্দ্রহৃদয় নগরের অধিবাসীরা তাদের রাজা রণধীরের কড়া শাসনে বরাবরই নিরুপদ্রবে জীবন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ একবার দেশে চোর ডাকাতের উপদ্রব হতে আরম্ভ করে। রাজা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও, শত শত প্রহরী নগরে রেখেও চোর-ডাকাতির উপদ্রব কমাতে পারলেন না। শেষে তিনি নিজেই ছদ্মবেশে একরাত্রে চোর-ডাকাতের উপদ্রব লক্ষ্য করতে বেরিয়ে পড়লেন।

নিশুতি রাতে রাজপথে এক জায়গায় এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর। তার পরিচয় যখন রাজা জানতে চাইলেন, সে রাজার ছদ্মবেশ দেখে তাকে চিনতে না পেরে বলল সদর্পে, 'আমি একজন চোর। আমার সঙ্গে আসবে, লোকের বাড়ী চুরি করতে, সহজেই প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হবে,' অবলীলায় বলল সে। রাজা তার কথায় রাজী হয়ে তার সঙ্গে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঢুকে প্রচুর সোনাদানা ও অর্থ হস্তগত করল। তারপর সে রাজাকে নিয়ে নগরের কাছে এক সুড়ঙ্গপথে ঢুকে তার এই গোপন আবাসস্থলের দরজায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকে

গেল। সেই সময় চোরের এক দাসী পাতালঘর থেকে বেরিয়ে সুড়ঙ্গপথে তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমি রাজা রণধীর। চোর আমাকে কিজন্যে বসিয়ে ভিতরে গেল বলতে পার কি?' দাসীটি বলল, 'রাজা আপনি এক্ষুণি পালান। এ ভয়ানক মানুষ, আপনি যখন তার সম্বন্ধে সব জেনে গেছেন তখন ও আপনাকে হত্যা করবেই।' রাজা তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে নিজ প্রাসাদে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালে একদল যোদ্ধাপুরুষকে নিয়ে রাজা সেই সুড়ঙ্গপথে ঢুকে আকস্মিক চোরের ঘরে ঢুকে তাকে প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে নগরপালকে আদেশ দিলেন, তাকে মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর পরিভ্রমণ করিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে যেন শূলে চড়ান হয়।

ধর্মধ্বজ নামে এক ধনবান বনিকের কন্যা শোভনা তার বাড়ীর কাছ দিয়ে চোরটিকে ধরে নিয়ে যেতে দেখল। সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, চোরটিকে শূলে চড়ান হবে। চোরটির দৃপ্ত চেহারা ও বিষন্ন চোখ দেখে কেন যেন তার বেশ মায়া হল। সে তার পিতাকে বলল, এই চোরটির দুঃখে সে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে, যেমন করে হোক, তাকে বাঁচাতেই হবে। পিতার কাছে সে দিব্যি করল, যদি তার মুক্তি না হয় তাহলে সে প্রাণ বিসর্জন দেবে। ধর্মধ্বজ তখন রাজার সঙ্গে দেখা করে তাঁর কন্যার প্রার্থনার কথা বলে তার মুক্তির জন্য রাজার কাছে দরবার করলেন। তার মুক্তির জন্য যত ধনরত্ন লাগে দেবেন বললেন। কিন্তু রাজা অনড়, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল, তিনি বললেন, তাঁর নিজের স্বার্থের চেয়ে প্রজাদের স্বার্থ অনেক বড়, ধনরত্নের বিনিময়ে প্রজাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না—তিনি জানালেন। তখন ধর্মধ্বজ অগত্যা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন।

বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল যখন চোরকে, ঘাতক তাকে রসিকতা

করে তার মুক্তির জন্য একটি মেয়ের দরদের কথা তাকে বলল। চোর তা শুনে প্রথমে হাসল, পরে হাসি বন্ধ করে কেঁদে ফেলল হাপুস নয়নে।

বেতাল কাহিনিটি শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, চোর প্রথমে হাসল কেন, পরে কাঁদলই বা কেন। রাজা জবাব দিলেন, মৃত্যুসময়ে চোর তার প্রতি একটি মেয়ের অনুরাগ সঞ্চার হয়েছে জেনে হেসে ফেলল প্রথমে ; মেয়েটির কোন উপকারই সে করে নি, অথচ সে তার স্বার্থে সর্বস্ব দিতে চেয়েছিল, এই চিন্তা থেকেই চোর পরে কেঁদে ফেলেছিল।

চতুর্দশ উপাখ্যান

মধুমতী নগরের রাজা সুবিচারের কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে মনস্বী নামে এক ব্রাহ্মণকুমার ভালবাসতেন। একবার এই নগরের উপকণ্ঠে এক উপবনে দুজনের দেখা হয়। সেই থেকেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগসঞ্চার হয়। কিন্তু চন্দ্রপ্রভা রাজার কন্যা। তাকে বিবাহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি ভূদেব নামে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পুরুষের কাছে সব কথা খুলে বলে তাঁর সাহায্য চাইলেন। ভূদেব তাঁকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন; এই মন্ত্রবলে তিনি একটি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার রূপধারণ করতে পারবেন বললেন। মনস্বী মন্ত্রবলে ষোল বছরের একটি মেয়ের রূপ পরিগ্রহ করলেন। ভূদেবও একটি মন্ত্রবলে আশীবছরের এক বৃদ্ধের রূপ ধরলেন।

ভূদেব মনস্বীকে নিয়ে রাজা সুবিচারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, তিনি ভিন দেশের মানুষ, তিনি তাঁর এই পুত্রবধূকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন তার পিত্রালয় থেকে। পিত্রালয় থেকে পুত্রবধূকে আপন গৃহে নিয়ে এসে দেখলেন মড়কে গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছে। ব্রাহ্মণী ও পুত্রের কোন সন্ধান এখনও পর্যন্ত তিনি পান নি। সেকারণে তিনি

রাজার কাছে তার পুত্রবধূকে কিছুদিনের জন্য রেখে যেতে চান জানালেন, গ্রামের অবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার তাকে নিয়ে যাবেন বললেন। রাজা রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে রেখে দিলেন তাঁকে। বৃদ্ধ ভূদেব রাজাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেলেন। রাজা ভূদেবের পুত্রবধূকে রাজকন্যার কাছেই রেখে দিলেন। রাজকন্যা তার একজন চব্বিশ ঘণ্টার সাথী পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল ; তার সঙ্গেই কথা বলে দিনরাত কাটিয়ে দেয়। একদিন রাজকন্যা তার সাথীর কাছে মনস্বীর প্রসঙ্গ পেড়ে বলল, তাঁকে সে ভালবাসে, কিন্তু যেহেতু সে রাজকন্যা, তার পিতা তার এই পাত্রনির্বাচনে সায় দেবে না। তখন মনস্বী মন্ত্রবলে রমণীর রূপ ছেড়ে স্বরূপ প্রকাশ করলেন। রাজকন্যা বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেল, লজ্জায় আরক্তিম হল তার মুখ। মন্ত্রের শক্তি দেখে অভিভূত হয়ে গেল সে। তখন মনস্বী রাজকন্যাকে সবার অজান্তে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলেন রাজকন্যার ঘরেই। রাজপরিবারে কেউই তাদের বিবাহ সম্পর্কের কথা জানতে পারল না : কেননা, মনস্বী মন্ত্রবিদ্যাবলে প্রয়োজন অনুযায়ী নারীর রূপেই থাকতেন।

এরপর একদিন এক অমাত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজা সপরিবারে তার বাড়ীতে গেলেন। রাজকন্যা তাঁর সাথীকেও নিয়ে গেল। রাজকন্যার সঙ্গিনীটিকে দেখে অমাত্যপুত্রের অনুরাগ জন্মে যায়। পুত্রের মনের অবস্থা বুঝে সেই অমাত্য রাজার কাছে ঐ রমণীর সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব পাড়েন। রাজা অমাত্যকে তিরস্কার করে বলেন, 'বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে তুমি কি করে তোমার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব আনলে? মেয়েটির শ্বশুর অকৃত্রিম বিশ্বাসবলে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছে মেয়েটিকে, আর তুমি কি চাও, বিশ্বাসভঙ্গ করে শাস্ত্র ও লোকাচারকে পায়ে ঠেলে ফেলে দিই।' মন্ত্রী নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

এই বিবাহে সম্ভব হবে না জেনে মন্ত্রীপুত্র দিন দিন চিন্তায় চিন্তায়

ক্ষীণজীবি হয়ে পড়লো। মন্ত্রীর আর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার সীমা থাকল না; পুত্রের প্রাণ রক্ষা করাই তার এখন দায় হবে। এদিকে কয়েক বছর ধরে ভূদেবের আর কোন খবরই না পেয়ে রাজা ভাবলেন তার পুত্রবধূকে এভাবে আর কতদিন তার কাছে রাখা সম্ভব হবে। তখন তিনি ব্রাহ্মণের পুত্রবধূর কাছে প্রস্তাব পাড়লেন যে তার পিতা যখন আর আসছেন না, তার স্বামীরও যখন আর কোন খোঁজ নেই, তাঁর অমাত্যপুত্রের অভিলাষ অনুযায়ী তাকেই সে এখন বিবাহ করে সুখী হতে পারে। ভূদেবের পুত্রবধূ রাজাকে তিরস্কার করে বললেন, কোথায় তিনি নারীর ধর্ম রক্ষা করবেন, না নারীর অধর্মাচারণে প্ররোচনা দিচ্ছেন। রাজা খুবই লজ্জিত হয়ে প্রসঙ্গটি চাপা দিয়ে দিলেন।

মনস্বী তখন বুঝলেন আর রাজপরিবারে থাকা যাবে না, তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভূদেবের সঙ্গে দেখা করলেন। ভূদেব সব শুনে বেশ খুশীই হলেন। এবার তিনি তার সহচর শশীকে মন্ত্রবলে এক বিংশতিবর্ষীয় ছেলেতে রূপান্তরিত করলেন এবং তাকে নিয়ে রাজা সুবিচারের সঙ্গে দেখা করে বললেন তিনি তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে এসেছেন। তিনি শশীকে দেখিয়ে বললেন, এই তার পুত্র। রাজা সুবিচার মহা অস্বস্তি ও লজ্জার মধ্যে পড়লেন, কি করে বলবেন তিনি ব্রাহ্মণকে, যে তার পুত্রবধূ তার হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর পুত্রবধূর অন্তর্ধানের কথা জানিয়ে বললেন যে তিনি তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করবেন তাঁকে তিনি তাই দেবেন। তখন ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর জন্য মায়াকান্না করে রাজার কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁর পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিতে। রাজা সুবিচার সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা ও শশীর বিবাহ সম্পন্ন হল।

শশী ও চন্দ্রপ্রভাকে নিয়ে ভূদেব যখন গৃহে ফিরে এলেন তখন মনস্বী রাজকন্যাকে তাঁর স্ত্রীরূপে দাবি করলেন এবং বললেন যে তাঁদের

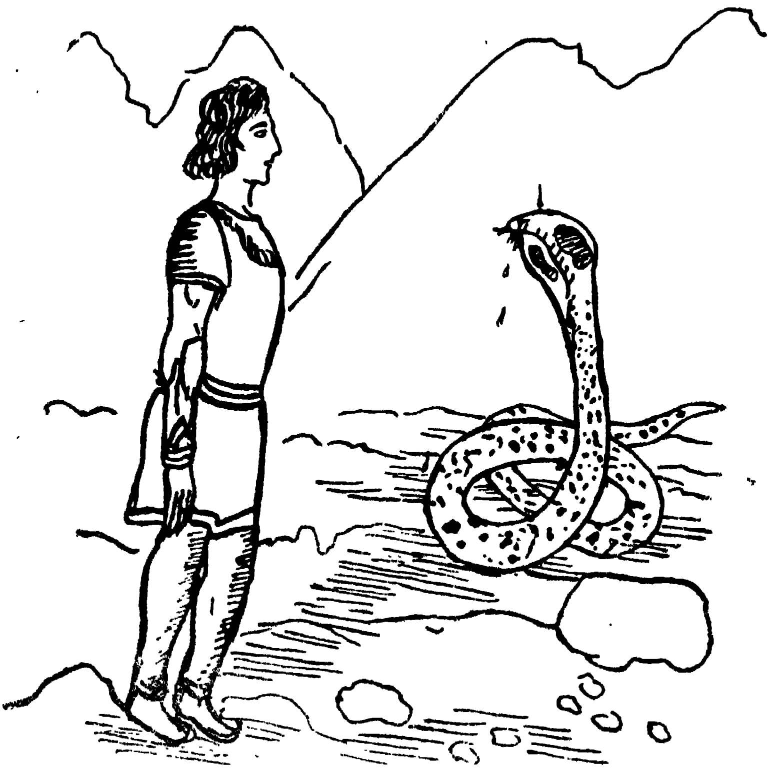
গান্ধর্বমতে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। শশীও বললেন, সর্বসমক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ বিবাহ হয়েছে তাঁর, চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে। একই রমণীকে দুজনেই নিজের স্ত্রী বলে বিবাদ শুরু করল।

এই পর্যন্ত বলেই বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, মনস্বী ও শশীর মধ্যে চন্দ্রপ্রভার প্রকৃত স্বামী কে? রাজা উত্তর দিলেন মনস্বী। কেননা, তিনি বললেন, রাজকন্যার সঙ্গে মনস্বীরই প্রথমে বিবাহ হয়েছে, গান্ধর্বমতেই হোক, আর শাস্ত্রমতেই হোক, দুই বিবাহই সমান বৈধ, যেহেতু চন্দ্রপ্রভার বৈধ বিবাহ প্রথমে মনস্বীর সঙ্গেই হয়েছিল তাই সে তাঁর প্রকৃত স্বামী।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত পুষ্পপুর নগরে রাজত্ব করতেন গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু। তার পুত্র জীমূতবাহন পিতারই মত উদার-হৃদয় ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁদের আমলে প্রজারাও সুখে সমৃদ্ধিতে ছিলেন। রাজ্যের শাসনকাজের ব্যাপারে জীমূতকেতু অমাত্যদের উপরেই নির্ভর করতেন, তিনি বেশির ভাগ সময়েই ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকতেন। অমাত্যরা রাজাকে রাজ্যের ব্যাপারে নির্লিপ্ত দেখে ধৈর্যহারা হয়ে তারা তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে পুষ্পপুর নগরের দুর্গ ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করল। অমাত্যদের মধ্যে এই বিদ্রোহ দেখে জীমূতবাহন পিতার কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে পিতা যদি তাকে আজ্ঞা দেন তাহলে সৈন্যবল নিয়ে তিনি অমাত্যদের বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন। পিতা থাকে নিবৃত্ত হতে বললেন, যুক্তি দেখালেন তিনি, জীবের প্রাণসংহার করা মহাপাপ, যুদ্ধবিগ্রহে অকারণ বহু জীবের প্রাণহানি হয়। সুতরাং সে পাপের কোন সীমা পরিসীমা নেই। তিনি পুত্রকে বললেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আত্মীয়দের পরামর্শে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ নিয়ে পরে বেশ অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, এই যুদ্ধবিগ্রহ, হিংসা দ্বেষ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রশান্ত নিরালা জায়গা মলয় পর্বতে তারা দুজনে যাবেন, ঈশ্বরের ধ্যানে দিন কাটাবেন তাঁরা সেখানে দুজনে।

মলয় পর্বতে পিতাপুত্র এসে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতে লাগলেন। একদিন মলয় পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে জীমূতবাহন একটি ধূসর স্তূপের মত কি দেখতে পেলেন। পিতাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে নাগেদের হাড়ের স্তূপ ওটি। পিতা তাকে বললেন, একবার গরুড়ের সঙ্গে নাগেদের প্রবল যুদ্ধ হয়। নাগেরা পরাজিত হয়ে গরুড়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে কথা দেয় যে তারা প্রতিদিন



একটি করে নাগ তার আহারের জন্য রাখবে। গরুড় তারপর থেকে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এখানে এসে একটি করে নাগ ভক্ষণ করে যায়।

সেইদিন মধ্যাহ্নে পিতাকে না জানিয়ে জীমূতবাহন সেই ধূসর স্তূপের কাছে এলেন। সেখানে এক বৃদ্ধা নাগিনীকে কাঁদতে দেখলেন

গভীর দুঃখে। জীমূতবাহন তাকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল তার পুত্র 'শঙ্খচূড়কে গরুড় ভক্ষণ করতে আসবে। তা শুনে জীমূতবাহন বলল, শঙ্খচূড়কে এখানে আসতে বারণ কর। আমিই আজ এখানে থাকব গরুড়ের খাদ্য হিসেবে।' তিনি নাগিনীকে বললেন, তিনি নিজের প্রাণ দিয়ে তার পুত্রের প্রাণরক্ষা করবেন। তখন নাগিনী বলল তাঁকে, 'নিজের পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য অপরকে প্রাণ-বিসর্জন দিতে দেওয়া আমার পক্ষে অধর্মের কাজ হবে।' ইতিমধ্যে শঙ্খচূড় সেখানে এসে জীমূতবাহনের অভিপ্রায়ের কথা শুনল। জীমূতবাহনকে সে বলল, তার নিজের প্রাণরক্ষায় সে কিছুতেই তাঁকে গরুড়ের শিকার হতে দেবে না। সে বলল, 'আমার মত নগণ্য জীব পৃথিবীতে কত জন্মাচ্ছে, মরছে। আমাদের জন্মমৃত্যুতে কারোর কিছু এসে যায় না। কিন্তু আপনার মত ধর্মাত্মা পুরুষ সংসারে খুবই কম জন্মলাভ করে। সুতরাং আমার জীবনরক্ষার্থে আপনার মৃত্যুবরণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আপনার মত দয়ালু ও পরোপকারী মানুষ বেঁচে থাকলে পৃথিবীর অধিবাসীদের অনেক কল্যাণ হবে।' জীমূতবাহন উত্তরে বললেন শঙ্খচূড়কে, 'ক্ষত্রিয়ের বংশে আমার জন্ম, আমরা ক্ষত্রিয়রা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা প্রাণত্যাগকে লঘুজ্ঞানে দেখি। সুতরাং প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণ রক্ষা করব। শঙ্খচূড় তখন জীমূতবাহনের কল্যাণে ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দিরে এসে মার কাছে প্রর্থনা জানাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর গরুড় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে জীমূতবাহনকে মুখে নিয়ে আকাশে উঠে গেল। রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল জীমূতবাহনের গা দিয়ে। কিন্তু জীমূতবাহন অব্যক্ত; যন্ত্রণাপ্রকাশও করছিল না সে; গরুড়ের ভোজ্যবস্তু হিসাবে সঁপে দিয়েছিল নিজেকে তার কাছে অবলীলায়। এদিকে শঙ্খচূড় মন্দির থেকে ফিরে এসে দেখে গরুড় জীমূতবাহনকে নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। শঙ্খচূড় চিৎকার করে বলল, 'গরুড় তুমি ভুল করে জীমূতবাহনকে নিয়ে যাচ্ছ। আমি

শঙ্খচূড়, আমাকেই তোমার নেওয়ার কথা।' গরুড় আকাশ থেকে সেকথা শুনে তার মুখের শিকারের দিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যিই তো এ মানুষ, এই তাহলে জীমূতবাহন। তখন গরুড় শূন্য থেকে নীচে নেমে এসে জীমূতবাহনকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল তাকে, 'তুমি কি উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে চাইছ?' জীমূতবাহন আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি মনে করি যে ব্যক্তি নিজেই তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ ক'রে পরোপকার করে, তার জীবন সার্থক। তাই আমি নিজের প্রাণ দিয়ে শঙ্খচূড়ের প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছি।' গরুড় জীমূতবাহনকে অসংখ্য সাধুবাদ জানিয়ে বলল, জগতে জীবমাত্রই নিজের জীবনরক্ষায় ব্যস্ত। কিন্তু আপন প্রাণ দিয়ে অন্যের প্রাণরক্ষা করা বিরল ব্যাপার, তোমার উদার মন ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।' জীমূতবাহন তখন গরুড়ের কাছে এই বর প্রার্থনা করলেন, আজ পর্যন্ত যত নাগ-নাগিনী গরুড়ের শিকার হয়েছে এখানে, যাদের অস্থি স্তূপাকার হয়ে আছে এখানে, তাদের সকলের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। তথাস্তু বলে গরুর পাতালপুরী থেকে অমৃত এনে তা সেই অস্থিস্তূপে সিঞ্চন করে সকল নাগ-নাগিনীর প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন।

কাহিনীটি শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়—এই দুজনের মধ্যে কার সৌজন্যবোধ অধিকতর বেশি বোধ হয়? রাজা উত্তর দিলেন, শঙ্খচূড়ের। কারণ হিসেবে বললেন, শঙ্খচূড় নিজের জীবনরক্ষায় জীমূতবাহনকে প্রাণবিসর্জন দিতে আপ্রাণ বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সেটাও ফলপ্রদ না হওয়ায় সে কাত্যায়নীর কাছে গিয়ে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করল। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, জীমূনবাহনও পরার্থে প্রাণ দিয়ে সৌজন্যবোধ ও ঔদার্যের পরিচয় দিল বটে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কাছে তা খুব একটা অসাধারণ ব্যাপার নয়।

ষোড়শ উপাখ্যান

চন্দ্রশেখর নগরের বণিক রত্নদত্ত একদিন রাজার কাছে এসে এই প্রস্তাব দিলেন যদি তিনি তাঁর কন্যা আহ্লাদিনীকে বিবাহ ক'রে রাজমহিষীরূপে গ্রহণ করেন তাহলে তাঁর মনের এক উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হয়। রাজা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে তাঁর অমাত্যদের মেয়েটির সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ করতে বললেন। তাঁরা খোঁজ করে দেখলেন মেয়েটি অসমান্যা সুন্দরী এবং খুবই সুলক্ষণা। রাজা এমন অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে রাণীরূপে পেলে রাজকার্যে খুবই অমনোযোগী হয়ে পড়বেন এই আশঙ্কায় তাঁরা রাজার কাছে এসে মেয়েটিকে কুরূপা ও দুর্লক্ষণা বলে পরিচয় দিলেন। তখন রাজা আর সেই মেয়েটির ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালেন না।

তখন সেই বণিক সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিলেন। ঘটনাক্রমে রাজা একদিন নগরভ্রমণে বেরিয়ে বলভদ্রের গৃহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই গৃহের ছাদে এক মনোহর রূপবতী কন্যাকে দাঁড়ানো দেখলেন। পার্শ্বচরকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটি কে। পার্শ্বচরটি উত্তর দিল, এই মেয়েটিকে বিবাহ করতে আপনি অরাজী হলে বলভদ্রের সঙ্গে এর বিবাহ হয়।

তখন রাজা বুঝলেন, অমাত্যরা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। তিনি অমাত্যদের ডেকে বললেন কেন তাঁরা তাঁকে বণিককন্যা আহ্লাদিনীর সম্পর্কে ভুল খবর দিয়েছিল। অমাত্যরা উত্তর দিল, এমন অপরূপ সুন্দরী রমণীর সঙ্গে যদি আপনার বিবাহ হত তাহলে অন্দরমহলেই আপনি বেশি সময় কাটাতেন, রাজকার্য দেখার সময় আপনি বিশেষ পেতেন না ; ফলে রাজ্যের অশেষ ক্ষতি হত। এই কারণেই আমরা রমণীটিকে কুরূপা ও অলক্ষণা বলে আপনার কাছে পরিচয় দিয়েছিলাম। রাজা বুঝলেন তাদের কথা যুক্তিযুক্ত, তাই তিনি এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর তাদের সঙ্গে কথা বললেন না।

কিন্তু রাজা আহ্লাদিনীর চিন্তায় চিন্তায় অস্থিরচিত্ত ও বিলক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, রাজকার্যে তার আর মতি থাকল না। বলভদ্র রাজার এই অবস্থা দেখে তাঁকে বললেন, 'প্রভু আপনি যদি অনুমতি দেন, এ দাস আপনার অভিলাষ পূর্ণ করবে। আপনি আহ্লাদিনীকে গ্রহণ করে চিন্তামুক্ত হোন। আপনার শরীর ক্রমশ ভেঙ্গে যাচ্ছে, ফলে এ রাজ্যও অনাথ হয়ে যেতে বসেছে। প্রভুর প্রতি দাসের এই মিনতিতে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন না আপনি আমার প্রতি।' রাজা তাঁর ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'পরস্ত্রী মাতৃবৎ ; তাঁকে গ্রহণ করতে বলে তুমি আমার উপকার না করে আমাকে ঘোর পাপে নিমজ্জিত করবে। এ অসম্ভব।' তখন বলভদ্র বললেন, 'আমি তাঁকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে অন্যত্র রাখব, তখন তাকে গ্রহণ করতে তো আপনার আপত্তি থাকবে না।' তা শুনে রাজা বললেন, 'পতিব্রতা রমণীর অপযশ করে তুমি মহাপাপী হবে। সে ঘৃণ্য কাজ করলে তোমাকে আমি প্রাণদণ্ড দেব।' একথা শুনে ভয় পেয়ে বলভদ্র আর রাজার মনের অশান্তি দূর করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়ায় সাহসী হল না। বলভদ্রের এহেন রাজ-আনুগত্য দেখে রাজা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। পর পর দশদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকে আহ্লাদিনীর চিন্তায় শরীরপাত করে দিলেন রাজা,

ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি, রাজবৈদ্যদের কোন চিকিৎসাই কাজ হল না, তাঁর মৃত্যু হল অবশেষে।

রাজার এই শোকাবহ মৃত্যুতে বলভদ্র উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। তিনি চিন্তা করলেন তিনিই রাজার মৃত্যুর কারণ। এ জীবন নিরর্থক বলে মনে হল তার, নিজের জীবন বিসর্জন দেবেন বলে ঠিক করলেন। কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে জন্মে জন্মে তিনি যেন এইরূপ ধর্মপরায়ণ রাজা পান। এই প্রার্থনা নিবেদনের পর তিনি অবিচলিতচিত্তে খড়্গ দিয়ে নিজের শিরোশ্ছেদন করলেন। তাঁর স্ত্রী আহ্লাদিনী এই খবর পেয়ে কাত্যায়নীর মন্দিরে এসে স্বামীর দ্বিখণ্ডিত দেহ দেখে নিথর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর খড়্গটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ভাবলেন স্বামী বিনা তাঁর জীবনের সার্থকতা কি। স্বামীর সহগামী হয়ে স্বামীর ধর্মপালনে পরকালে তার সদ্‌গতি হবে। তারপরেই তিনি খড়্গটি দিয়ে স্বামীর মতই নিজের শিরোচ্ছেদন করলেন।

বেতাল কাহিনীটি শুনিয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা, আহ্লাদিনী ও বলভদ্রের মধ্যে কার ঔদার্য বেশি। বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজার ঔদার্যই বেশি, কেননা রাজা আহ্লাদিনীর জন্য প্রাণত্যাগ করলেন, অধর্ম ও অপযশের ভয়ে তিনি তাকে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করলেন তা। আর অভূতপূর্ব কিছু নয়, প্রভুভক্তির জন্য বলভদ্রের প্রাণবিসর্জন দেওয়া; আহ্লাদিনী স্বামীর অনুবর্তিনী হয়েছিলেন, এটাও অসাধারণ কোন ব্যাপার নয়; স্বামীর ধর্মই স্ত্রীলোক পালন করে।

সপ্তদশ উপাখ্যান

হেমকূট নগরের ধার্মিক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার পুত্র গুণাকর অল্প বয়স থেকেই অসৎ সংসর্গে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে সে পিতার সমুদায় অর্থ নিঃশেষ করে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করতে শুরু করে। বিষ্ণুশর্মা অবশেষে পুত্রকে গৃহ থেকে বহিস্কৃত করে দেন।

গুণাকর তখন মনের দুঃখে নগরের প্রান্তে শ্মশানে চলে এল। সেখানে এক সন্ন্যাসীকে যোগসাধনা করতে দেখে তাঁর সামনেই বসে পড়ল। অল্পক্ষণ পর সন্ন্যাসী চোখ খুলেই তাকে দেখে বললেন, 'তোমার মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছে। তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে।' গুণাকর মাথা নাড়ল। সাধু তখন একটি নরকপালের ওপর কিছু অন্নব্যাঞ্জন এনে তাকে খেতে দিলেন। গুণাকর তা দেখে সন্ন্যাসীকে বলল, এইভাবে অন্ন গ্রহণ করতে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তখন যোগী চোখ বুজে মন্ত্রবলে এক যক্ষকন্যাকে অহ্বান করে আনলেন। সে আসামাত্রই সন্ন্যাসী তাকে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ খুবই ক্ষুধার্ত, এর থাকাখাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দাও।' যক্ষকন্যা মায়াবলে এক

সুসজ্জিত হর্ম তৈরি করল সেখানে। ব্রাহ্মণকে সেই হর্মগৃহে নিয়ে গিয়ে রাজঐশ্বর্য লাভ করার সুযোগ করে দিল সে। থরে থরে সুস্বাদু সব খাবার নিয়ে এল তার জন্য; তার সেবাযত্নের কোন ত্রুটি করল না। মহাসুখে দিনটা কাটল গুণাকরের। রাতে রাজকীয় খানা খেয়ে মণিমাণিক্যখচিত পালঙ্কে গভীর সুখে নিদ্রা গেল সে। পরদিন ভোরে উঠে সেই রাজপ্রাসাদে আর রমণীটির কোন চিহ্নই সে দেখতে পেল না। সন্ন্যাসীর সামনে মাটিতেই বসে আছে সে। মহাশ্চর্য হয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল, এতক্ষণ কি সে স্বপ্ন দেখছিল। সন্ন্যাসী তাকে বললেন, 'এই যক্ষকন্যা আমার যোগবলেই এসেছিল। তুমিও তাকে আনতে পারবে এবং চিরকালই তোমার কাছে রাখতে পারবে যদি তুমি যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ কর।' তখন গুণাকর যোগসাধনায় উৎসাহী হয়ে বলল তাকে দীক্ষা দিতে। সন্ন্যাসী তখন তাকে একটি মন্ত্র দিয়ে জলে আকণ্ঠ ডুবে থেকে চল্লিশ দিন জপ করতে বললেন তাকে একাগ্রমনে। চল্লিশ দিন জপ করার পর সে সন্ন্যাসীর কাছে এসে বলল তার জপমন্ত্র পড়া শেষ হয়েছে। তখন সন্ন্যাসী বললেন তাকে, এবারে আরও চল্লিশ দিন প্রজ্বলিত বহ্নিতে প্রবেশ করে জপমন্ত্র করতে হবে তাকে। তা শুনে গুণাকর বলল, অনেকদিন সে বাবা-মাকে দেখে নি। পিতা মাতার চরণ-ধূলি নিয়ে সে আবার এখানে এসে মন্ত্রসাধনা করবে বলল। সন্ন্যাসীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে হেমকূট নগরে তার গৃহে চলে গেল।

গুণাকরকে ফিরে পেয়ে তার বাপ-মার আনন্দ ধরে না। ছেলের মধ্যে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে, তাতে তারা আনন্দিত হল খুবই। কিন্তু গুণাকর বলল তাঁদের, সে এখানে কয়েকদিনের জন্য থাকবে। তারপর সে ফিরে যাবে সন্ন্যাসীর কাছে। তখন তার পিতামাতা তাকে বললেন, গৃহাশ্রম সকল আশ্রমের মূল এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতামাতাই ধর্ম, পিতামাতার সেবা করলেই পুত্রের ধর্মপালন করা হয়। সুতরাং তাঁরা যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন যোগাভ্যাসের

প্রয়োজন নেই তার। সে তাঁদের একমাত্র পুত্র, মা-বাবা বলার কেউ নেই আর তাদের ; সেই তাঁদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। একমাত্র পুত্র তাদের পরিত্যাগ করলে জীবনও তাদের শেষ হয়ে যাবে ; অন্তত তাদের মৃত্যু পর্যন্ত যেন সে তাঁদের কাছে থাকে। গুণাকর সেই উপদেশের মধ্যে কোন সারবস্তু খুঁজে পেল না। সে চিন্তা করল, এই মায়াময় জগতে কেউ কারোর নয়, প্রপঞ্চময় জগতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন সকল সম্পর্কই অসার। জীবনের সারসত্যে পৌঁছতে হলে তাকে তপস্যা করতেই হবে এই ধারণা থেকে সে পিতা-মাতার কথা অগ্রাহ্য করে সন্ন্যাসীর কাছে এসে আবার যোগসাধনায় বসল। কিন্তু শত তপস্যা সত্ত্বেও সিদ্ধকাম হতে পারল না।

এই পর্যন্ত শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল মহারাজ, কেন গুণাকরের সাধনা সিদ্ধ হল না।' রাজা উত্তর দিলেন, দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মনে সাধনায় বসেছিল সে নাহলে সাধনার মাঝে চিত্তচাঞ্চল্য আসবে কেন তার, পিতামাতাকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হবেই বা কেন সে। যোগতপস্যায় একাগ্রচিত্ত ছিল না বলে, নিষ্ঠার অভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল না তার।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

কুবলয়পুরের ঐশ্বর্যশালী বণিক ধনপতির কন্যা ধনবতীর বিবাহ হয়েছিল গৌরীদত্ত নামে এক প্রতিষ্ঠিত বণিকের সঙ্গে। একটি যুবতী কন্যা রেখে গৌরীদত্ত আকস্মিক পরলোকগমন করলে তাঁর আত্মীয়রা ধনবতীর অসহায় অবস্থা দেখে তাঁর সর্বস্ব ছিনিয়ে নিল। তখন ধনবতী তাঁর কন্যা মোহিনীর হাত ধরে শ্বশুরবাড়ী পরিত্যাগ করে পিত্রালয়ে যাত্রা করলেন।

পথে এক শ্মশানে এসে উপস্থিত হল তারা দুজনে। সেখানে রাজদণ্ড বলে এক চোরকে শূলে চড়ানো হয়েছিল। তিন দিন ধরে সে শূলে বিদ্ধ অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার প্রাণবিয়োগ হয় নি। ধনবতীকে দেখে চোর করুণ স্বরে বলল, 'একটুক্ষণ দাঁড়ান, আমার একটা কথা শুনে যান। রাজাদেশে আমাকে শূলে চড়ানো হয়েছে কিন্তু সহজে আমার মৃত্যু হবে না। মৃত্যুযন্ত্রণা আমোকে অনির্দিষ্টকাল সহ্য করতে হবে। কেননা ভাগ্যলিখন আমার এমনই যে অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে না। যদি আপনি কৃপা করে আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করেন আমায়, তবেই মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। আপনি যদি আপনার কন্যার সঙ্গে এখনই আমার বিবাহ দেন তাহলে আমার যাবতীয় ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে সে।' ধনবতী চোরকে বললেন, এ প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু বিবাহ হলেই তো

তার মৃত্যু হবে, ফলে নাতির মুখদর্শন করার সুযোগ পাবেন না তিনি। তা শুনে চোর বলল, 'আপনি এখন আমার মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন। আমি অনুমতি দিচ্ছি, আপনি পরে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানকে ধনদান করে আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করবেন। তাহলে আপনার কন্যা বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে এবং আপনিও আপনার নাতির মুখ দেখার সুযোগ পাবেন।' ধনবতী সেকথায় খুশী হয়ে কন্যার বিবাহ দিলেন তার সঙ্গে সেই শূলবিদ্ধ অবস্থায়। মৃত্যুর আগে চোর তার গৃহের ঠিকানা দিয়ে বলল, গৃহটির পুব দিকে একটি কুয়োর কাছে একটি বটবৃক্ষের গোড়ায় মাটির তলায় তার সব ধনসম্পত্তি পোঁতা আছে। ধনবতী তখন কন্যাকে নিয়ে চোরের নিশানা মত নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পোঁটলায় বাঁধা চোরের ধনরত্ন নিয়ে পিত্রালয়ের দিকে যাত্রা শুরু করল আবার।

ধনবতী পিত্রালয়ে এসে এক সুপাত্র ব্রাহ্মণ পুত্রের খোঁজ করে তার সঙ্গে তাঁর কন্যা মোহিনীর বিবাহ দিলেন। বৎসর ঘুরে গেলে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। সূতিকাসময়ে ষষ্ঠীর রাতে সে স্বপ্নে দেখল বৃষের উপর বসা ভস্মাচ্ছদিত জটাধারী ত্রিশূল হাতে এক পুরুষ তার সামনে এসে বলছেন তাকে, 'এই শিশু ক্ষণজন্মা, অশেষ সুলক্ষণ-যুক্ত। পোটিকার মধ্যে সহস্র মোহরের সাথে একে রাজদ্বারে রেখে এস ; এ একদিন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজ রাজ্যেশ্বর হবে।' সেই রাতে মোহিনী তখুনই মাকে তার স্বপ্নের বৃত্তান্তের কথা বলল। ধনবতী সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী একটি পোঁটলার মধ্যে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রেখে তার মধ্যে শিশুসন্তানটিকে শুইয়ে সেটিকে রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে রেখে এলেন। রাজাও ঐ রাতে স্বপ্ন দেখলেন, সেই ত্রিশূলধারী পুরুষ রাজার সামনে এসে বলল যে রাজদ্বারে পেটিকার মধ্যে রাজলক্ষণযুক্ত এক শিশুসন্তান রয়েছে। সে-ই রাজার উত্তরাধিকারী হয়ে এই রাজ্যের অধিপতি হবে। রাজা সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে মহিষীকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে তাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের ফটকের

কাছে এসে দেখলেন, সত্যিই পেটিকার মধ্যে একটি শিশুসন্তান শুয়ে আছে আর পেটিকার মধ্যে থরে থরে স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে।

সকালবেলায় রাজা জ্যোতিসবিদদের ডেকে আনিয়ে তাদের দিয়ে শিশুটির লক্ষণ পরীক্ষা করালেন। পণ্ডিতেরা শিশুটিকে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, শিশুটি খুবই সুলক্ষণযুক্ত। এর দীর্ঘ আকৃতি, উন্নত ললাট ও প্রশস্ত বক্ষ এর সৌভাগ্যরই পরিচায়ক। রাজতিলক রয়েছে এর কপালে। রাজা পণ্ডিতদের মুখে শিশুসন্তানটির সুলক্ষণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের অকুণ্ঠ দানধ্যান করে আনন্দ-উৎসব করলেন।

শিশুটির যখন ছয় মাস বয়স হল, তখন রাজা ধুমধাম করে তার অন্নপ্রাসন দিয়ে তার নাম রাখলেন হরদত্ত। বয়ঃপ্রাপ্তি হলে হরদত্ত সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হল। কালক্রমে রাজা লোকান্তরিত হলে হরদত্তই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। মোহিনী ও রাজার দেখা স্বপ্ন অবশেষে ফলবতী হল।

কিছুদিন পরে রাজা হরদত্ত তীর্থপর্যটনে পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করতে গেলে, পিণ্ড গ্রহণ করার জন্য নদীবক্ষ থেকে তিনজনের দক্ষিণ হস্ত একে একে উঠে এল। প্রথমটি তার মাতৃকরগ্রহণকারী চোরের, দ্বিতীয়টি জন্মদাতা ব্রাহ্মণের, তৃতীয়টি প্রতিপালক রাজার।

বেতাল বিক্রমাদিত্যের কৌতূহল জাগিয়ে রেখে কাহিনীটি এই পর্যন্ত বলে জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, এই তিনজনের মধ্যে হরদত্তের পিতার অধিকারী কে হতে পারে। রাজা বললেন, চোর। তার উত্তরের সপক্ষে বললেন তিনি, চোর অর্থদান করে হরদত্তের মাতাকে বিবাহ করেছিল, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকুমার অর্থের বিনিময়ে তার মাতাকে গ্রহণ করেছিল, রাজাও অর্থের বিনিময়ে, সহস্রঅর্থমুদ্রা ভেট নিয়ে প্রতিপালন করেছিল তাকে।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

চিত্রকূট নগরের রাজা রূপদত্ত একদিন একাকী ঘোড়া ছুটিয়ে মৃগয়ার অন্বেষণে বনে বনে ঘুরে অবশেষে এক ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন, আশ্রম সন্নিহিত আলোছায়ায় ঘেরা ভরাযৌবন দীঘিটি আশ্রমের ধ্যানগম্ভীর রূপকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। দীঘির পাড়ে বসে দেখলেন, দীঘির কোন কোন অংশ পদ্মপাতায় ছেয়ে গিয়েছে আর তার মাঝে পদ্মের কুঁড়ি বা পদ্মফুল জেগে উঠে দীঘিটিকে এক অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। দীঘির পার বরাবর ঘাসের সবুজ আস্তরণ। পাশেই পুষ্পোদ্যানে ফুলগাছগুলি একে অপরের গায়ে গা লাগিয়ে মৃদুমন্দ বাতাসের দোলায় দোল খেয়ে চলেছে। পাতার খসখসানি, ঝিরঝিরে বাতাসের পরশ, রঙ-বেরঙের ফুলের দৃষ্টিনন্দন রূপ, স্নিগ্ধ কুসুম-বাস, দীঘির টলটলে স্থির জল, ভাসমান পদ্মপাতা, জলপদ্মের উঁকিঝুঁকি—সব মিলিয়ে তাঁর মনে হচ্ছিল প্রকৃতি যেন নিজের সব সৌন্দর্য উজাড় করে তাঁর সামনে বিস্তার করে দিয়েছে নিজেকে। এমন সময় দেখলেন দীঘির পাড়ে কিছুটা দূরে এক ঋষিকন্যা এসে স্নান করতে নামল জলে। জলসিক্ত

বসনেই স্নান সেরে আবার ফিরে চলে গেলেন ঋষিকন্যাটি। একটু পরেই দেখলেন তিনি, এক সৌমদর্শন-ঋষি-ফুল-ফল-কুশ সংগ্রহ করে তাঁর দিকেই আসছেন। সেই ঋষিকুমারী ভিজে এলো চুলে কোমরে বক্ষের কাপড় গুঁজে তাঁর পিছনে পিছনে আসছেন, লক্ষ্য করলেন তিনি। ঋষিকে দেখামাত্রই রাজা তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তাঁকে। তাঁর অভীষ্টসিদ্ধি হবে বলে ঋষি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। রাজা রূপদত্তের মনে দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল তখনই। তিনি ঋষিকে বললেন যে তিনি তো বলেছেন তার অভীষ্ট সিদ্ধি হবে, তাহলে এখনই তার একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেটা কি পূর্ণ হবে। ঋষি বললেন, নিশ্চয়ই। তখন রাজা ঋষির কাছে প্রার্থনা জানালেন যে তাঁর কন্যাকে তার হাতে সম্প্রদান করা হোক। ঋষি রাজার খলবুদ্ধির কথা বুঝতে পারলেন, কিন্তু তার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে গিয়েছে, তাঁর তো অন্যথা হবার নয়। তিনি রাজার সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য দিলেন, তিনি যে তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করেছিলেন।

ঋষির কাছে থেকে বিদায় নিয়ে রাজা তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চিত্রকূটের দিকে যাত্রা করলেন। পথে রাত নেমে এলে এক গাছের তলায় তারা দুজনে ঘোড়া থেকে নেমে সেখানে কিছু ফলমূল খেয়ে কাপড় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। এমন সময় এক রাক্ষস এসে রাজাকে বলল, 'তোমার পত্নীকে আমার চাই, তাকে আমি ভক্ষণ করব।' তখন রাজা বললেন, 'স্ত্রী আমার প্রাণাধিক, তাকে ছাড়া অন্য যা কিছু চাও দেব।' রাক্ষস তখন বলল, তুমি যদি নিজ হাতে বারো বছরের একটি ছেলের শিরোচ্ছেদন করে আমাকে দিতে পার তবেই আমি তোমার স্ত্রীকে রেহাই দেব।' রাজা তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মত হলেন, তিনি প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষার্থে ব্রাহ্মণ সন্তানকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবেন না বললেন, রাক্ষসকে তিনি সাতদিন বাদে চিত্রকূট নগরে তার রাজসভায় দেখা করতে বললেন।

রাজা রূপদত্ত রাজ্যে ফিরে এসে প্রধান অমাত্যের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, কিভাবে তাঁর স্ত্রীকে রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় একটি ব্রাহ্মণসন্তানকে স্বহস্তে বলি দিয়ে। মন্ত্রী বললেন সে ব্যবস্থা তিনি অনায়াসে করবেন।

মন্ত্রী একটি পুরুষপ্রমাণ প্রতিমা তৈরী করে নগরের একটি সুরক্ষিত স্থানে রেখে দিয়ে ঘোষণা করলেন রাজ্যজুড়ে, যে ব্রাহ্মণ তার কিশোর পুত্রকে বলিদানের জন্য পাঠাবেন তাকেই এই স্বর্ণপ্রতিমা উপঢৌকন দেওয়া হবে।

এক দুঃস্থ ব্রাহ্মণ সেই লোভে তার পুত্রকে প্রতিমাটির কাছে বলিদানের জন্য পাঠাতে মনস্থ করল। ব্রাহ্মণীর ঘোর অমত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণকে টলাতে পারল না। ব্রাহ্মণ তাকে বোঝাল যে তাদের অভাব অনটন কোনদিনই ঘুচবে না। এই উপলক্ষ্যে যদি তাদের অবস্থা ফিরে যায়, দোষ কি। ব্রাহ্মণ তার বালক পুত্রকে নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করল। রাজা বালকটিকে নিজের কাছে রেখে দিলেন, ব্রাহ্মণকে কয়েকদিন পর একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁর কাছে আসতে বললেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাক্ষস রাজার কাছে এসে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত বলি গ্রহণ করতে এল। রাজা সেই ব্রাহ্মণবালককে যখন বলি দিতে গেলেন, তখন বালকটির মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে কাহিনীটি শুনিয়ে বললেন, 'মহারাজ, মৃত্যুর সময় সকলেরই মুখ করুণ হয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বালকটির মুখে হাসি দেখা গেল কেন।' রাজা উত্তর দিলেন, 'বাল্যকালে পিতামাতা প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাজা মানুষকে রক্ষা করেন।'

বিংশ উপাখ্যান

বিশালপুরের নগরের ধনাঢ্য বণিক অর্থদত্তের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ হয়েছিল কমলপুরের মদনদাস বণিকের সঙ্গে। বিবাহের কিছুদিন পর মদনদাস তাঁর পত্নীকে পিত্রালয়ে রেখে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে প্রবাসে চলে যান।

গৃহে স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অনঙ্গমঞ্জরীর মনে বেশ ক্ষোভ জম্মে যায় স্বামীর প্রতি। এই সময় একদিন কমলাকর নামে এক সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু দুজনেই বুঝতে পারেন এই জাতীয় অনুরাগ অত্যন্ত গর্হিত। পরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হওয়ায় কমলাকর তা কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। অনঙ্গমঞ্জরী বিবাহিতা বলে তিনিও কমলাকরের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা নিজের মনেই রেখেছিলেন। অনঙ্গমঞ্জরী আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে অহোরাত্র কমলাকরের চিন্তায় চিন্তায় শয্যা নিলেন। এই শয্যাগ্রহণই তাঁর কাল হল এবং তাঁর প্রাণরক্ষা করা গেল না। তাঁব মৃত্যুর খবর কমলাকরের কাছে পৌছলে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে

যান। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি অনঙ্গমঞ্জরীর শোকে। বিশালপুর নগরের অধিবাসীরা এই ঘটনার কথা জেনে দুজনকেই একই চিতায় দাহ করার ব্যবস্থা করল। দৈবক্রমে অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী মদনদাস এই সময়ই বিদেশ থেকে শ্বশুরবাড়ীতে এসেছিলেন। তিনিও এই খবর পেয়ে শোকাহত হয়ে শ্মশানে গিয়ে ঐ জ্বলন্ত চিতাতে প্রাণবিসর্জন দিলেন।

কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যের কাছে জানতে চাইলেন, মদনদাস, কমলাকর ও অনঙ্গমঞ্জরীর মধ্যে কে বেশী দুর্বল চরিত্রের মানুষ। বিক্রমাদিত্য বললেন, মদনদাস; স্ত্রীর চারিত্রিক স্খলন হওয়া সত্ত্বেও সে স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতায় তার চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল।

একবিংশ উপাখ্যান

জয়স্থল নগরের ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামীর চার পুত্রই ছিল অপদার্থ। প্রথমজন ছিল দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত, দ্বিতীয়জন ছিল লম্পট, তৃতীয়জন ছিল বেহায়া নির্লজ্জ, চতুর্থজন নাস্তিক। ব্রাহ্মণ পুত্রদের এই বিকৃত চরিত্র দেখে তাদের একদিন একত্র করে খুব তিরস্কার করে বললেন, 'যে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত তার ঘরে অলক্ষ্মী থাকে অহর্নিশ, দ্যূতাসক্ত মানুষের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না, ধর্মাধর্ম বিচার শক্তি থাকে না তার। আর লম্পট যে মানুষ সে ইন্দ্রিয়সুখের তাড়নায় দুঃখের অনলে জ্বলে মরে। ইন্দ্রিয় পরায়ণ মানুষেরা চরম অতলে তলিয়ে গিয়ে শেষে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। আর নির্লজ্জ বেহায়া মানুষ গর্হিত কাজ করেও বিবেকবর্জিত হয়, লোকনিন্দার ভয় থাকে না তার। আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তার মতো পাষণ্ড আর একটিও নেই। দেবতা ও গুরুজনের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিমান না হয়, ধর্মশাস্ত্রে অভক্তি থাকে যার, তার মতো পাপীমন আর একটিও নেই। আমি এইসব মানুষদের মৃত্যু কামনা করি।'

পিতার এই ভর্ৎসনা শুনে চার পুত্র নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, ছোটবেলায় তারা লেখাপড়া না শিখে ভুলই করেছিল, তার ফলেই আজ তারা বিকৃত জীবনযাপন করছে। তারা তখন পরামর্শ করে একসঙ্গে বিদেশে গেল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। কিছুদিন বাদে বিদেশ ভ্রমণ সাঙ্গ করে তার দেশের পথে পাড়ি দিল।

পথে তারা এক জায়গায় এক চর্মকারকে মৃত একটি বাঘের চামড়া ও মাংস ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখল। বাঘের হাড়গোড় পড়ে থাকল মাটিতে। চার ভাইয়ের মধ্যে একজন অস্থিসজ্ঘটনী বিদ্যা শিখেছিল। সে বাঘের অস্থিগুলো একত্র করে তার একটি কঙ্কাল তৈরি করল, দ্বিতীয়জন মাংসঙ্কলনী বিদ্যা দ্বারা কঙ্কালে মাংস জুড়ে দিল। তৃতীয়-জন কর্মযোজনী বিদ্যা দ্বারা বাঘের শরীরে চামড়ার আচ্ছাদন দিল।



এবারে প্রাণহীন একটি বাঘের সৃষ্টি হল। বাঘের পড়ে থাকা অস্থি-গুলিকে নিয়ে চতুর্থজন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দিয়ে বাঘটির প্রাণসঞ্চার করল তখন। তারপরেই সেই বাঘ চারজনেরই প্রাণসংহার করল।

কাহিনীটি শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন, চার ভাইয়ের মধ্যে কোন্‌জন সর্বাপেক্ষা নির্বোধ। রাজা উত্তর দিলেন, যে ভাই বাঘের প্রাণদান করল, সেই সর্বাপেক্ষা নির্বোধ।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

বিষ্ণুপুর গ্রামের নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ ও বয়সের ভারে অশক্ত হয়ে গেলেও তাঁর মধ্যে ভোগসুখের স্পৃহা বিন্দুমাত্র অবদমিত হল না। বরং তাঁর কামনাবাসনা দিন দিন প্রবলতর হতে লাগল। তিনি পরদেহ প্রবেশিনী নামে মন্ত্র বিদ্যাবলে দেহে আমূল পরিবর্তন আনতে পারতেন। কিন্তু নিজ দেহের পরিবর্তন সাধন করলে তিনি তাঁর পরিবার পুত্রজনের কাছে অত্যন্ত হেয় হয়ে যাবেন বুঝলেন। তখন তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে পরিবার পরিজনদের বললেন যে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি এখন সংসারধর্ম ত্যাগ করে বাণপ্রস্থে যাবেন: এতদিন তিনি বিষয়ভোগেই জীবন কাটিয়েছেন, কখনও তিনি পরকালের হিতাহিত চিন্তা করেন নি, তাই তিনি অরণ্যে গিয়ে যোগসাধনা করে প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন বললেন। সংসারের কেউই তাঁকে মোক্ষলাভের জন্য তাঁর এই আকুতিকে নিরুৎসাহিত করল না তাঁকে।

ব্রাহ্মণ অজ্ঞাতবাসে গিয়ে তার পরদেহ প্রবেশিনী বিদ্যাবলে একটি যুবকের আকার ধারণ করলেন। যুবকের আকার ধারণ করায়

আগে কেঁদে ফেলেছিলেন ব্রাহ্মণ, যুবকের শরীর লাভ করার পর আবার হেসে উঠলেন।

বেতাল জিজ্ঞেস করলেন বিক্রমাদিত্যকে, কেন ব্রাহ্মণ প্রথমে কাঁদলেন, তারপরে হাসলেন। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, যুবকের রূপ পরিগ্রহ করার আগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে পরিবারের কথা উদয় হওয়াতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল, আর যুবকের রূপলাভ করে খুশীতে হেসে ফেলে সে।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণের দুই পুত্র ছিল। তাঁর একপুত্র ছিল ভোজনবিলাসী, অপর পুত্র শয্যাবিলাসী। নিজ নিজ ক্ষেত্র দুজনেই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। রাজার কানেও এই দুজনের কথা এসে পৌঁছল।

রাজা তাদের দুজনকে লোক মারফত আমন্ত্রণ করে এনে দুজনকেই পরীক্ষা করতে চাইলেন, প্রথমজনের জন্য তিনি নানা উপাদেয় খাবার আনিয়ে দিলেন। তার খাওয়া হয়ে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরকম খাওয়া হয়েছে। সে বলল, খাওয়াটা মোটেই ভালো হয় নি। রাজা তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন, খাওয়া ভাল হয় নি মানে। উত্তরে বলল সে, 'খাদ্যের মধ্যে শবের গন্ধ পেলাম। মনে হয় শ্মশানের কাছাকাছি কোন খেত থেকে এই তণ্ডুল আনা হয়েছে।' রাজা লোক দিয়ে খোঁজ করিয়ে জানতে পারলেন ভোজন-রসিকটির কথাই ঠিক, শ্মশান সন্নিহিত একটা খেত থেকেই তণ্ডুল এনে রান্না করা হয়েছিল।

রাজা শয্যাবিলাসীকে এক মহামূল্য পালঙ্কে দুগ্ধফেনিল তুলতুলে নরম গদির পাহাড়ের ওপর শুতে দিলেন। পরদিন ভোরে রাজা শয্যাবিলাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে ঘুম কেমন হল। শয্যাবিলাসী বলল, ঘুম ভাল হয় নি। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন। সে বলল, সপ্তম গদির তলায় একটি চুল ছিল তার জন্য তার ঘুমোতে বেশ অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন পূজাপাঠ করে শেষে পুত্রের মুখ দেখতে পান, তাঁর পুত্র অল্পকালের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে করাল রোগে যজ্ঞশর্মার পুত্রের মৃত্যু হয়। পিতামাতা পুত্রশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করার জন্য চিতা সাজাবার ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন বুকভাঙ্গা প্রাণে। শ্মশানে এক যোগী এই মৃত তরুণটিকে দেখে ভাবলেন, তাঁর নিজের শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গিয়েছে, যোগাভ্যাস করতে এখন বেশ কষ্ট হচ্ছে, তরুণের শরীর পেলে বহুদিন যোগসাধনা করতে পারবেন। যোগী পরকলেবর প্রবেশিনী বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণপুত্রের দেহে প্রবেশ করে এক যুবাপুরুষের রূপ ধারণ করলেন। যজ্ঞশর্মা পুত্রকে পুনর্বার জীবিত দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরতে গেলেন, পরক্ষণেই বিষণ্নমনে ঘরে ফিরে গেলেন।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্রাহ্মণ প্রথমে আনন্দিত হল, পরে বিষণ্ণ হল কেন? রাজা উত্তর দিলেন, ব্রাহ্মণ প্রথমে ভেবেছিলেন, তার পুত্র বুঝি সত্যিই জীবিত, তাই তিনি হেসেছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলেন মন্ত্রবিদ্যাবলে অন্য কেউ এর শরীরে প্রবেশ করেছে, তাই তিনি বিষণ্ন হয়ে গেলেন পরে।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্মপুর নগরের রাজা মহাবল একবার প্রতিপক্ষ রাজার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরাজিত হলেন এবং নিজের প্রাণ ও মান বাঁচাতে তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে অরণ্যে প্রস্থান করলেন। অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা তিনজনেই বেশ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। রাজা মহিষী ও কন্যাকে একটি গাছের তলায় বসিয়ে রেখে খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন।

ঐ দিনে কুন্তিবনের রাজা তার জেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে সেই অরণ্যে শিকারে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা গাছের তলায় যুথভ্রষ্ট হরিণীর মত দুজন রমণীকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানতে পারলেন, তারা হলেন ধর্মপুরের রাণী ও রাজকন্যা। রাজা মহাবল রাজ্য হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে রাণী ও কন্যাসহ এই জঙ্গলে এসেছেন জানতে পারলেন তারা। অনেকক্ষণ ধরে রাজার প্রত্যাগমনে কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন বিবেকের খাতিরে মহাবলের রাণী ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কুন্তিনের রাজা নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিলেন তাদের। মহাবলের কন্যার সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিলেন কিছুদিন পর।

এদিকে জঙ্গলে পরিত্যক্ত অবস্থায় এক গাছের নীচে মহাবলের রাণী ও কন্যাকে দেখতে পেয়ে যখন কুন্তিনের রাজা তাদের নিয়ে চলে গেলেন তার অল্পক্ষণ পরই মহাবল সেই গাছতলায় এসে স্ত্রী ও কন্যাকে দেখতে না পেয়ে মনের ভারসাম্য হারিয়ে জঙ্গলের নিকটবর্তী এক খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ধর্মপালের জায়গায় তুমি থাকলে তুমিও কি তাঁর মত আত্মবিসর্জন দিতে।' রাজা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন।

শেষকথা

বেতাল বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৈর্যের অশেষ প্রশংসা করে তাঁর কল্যাণার্থে কয়েকটি কথা তাকে শোনাতে বসলেন।

শবেস্থিত বেতাল বললেন, 'কুমোরের বংশে জাত শান্তশীলই হল এই যোগী যে তোমাকে বেতালকে আনার দায়িত্ব দিয়েছে। আর যে শব নিয়ে তুমি চলেছ তা রাজা চন্দ্রভানুর। শান্তশীল যোগসিদ্ধির জন্য চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করে কিছুটা পথ এগিয়েছে। এবারে তোমাকে বলি দিলেই তার অষ্টসিদ্ধি লাভ হবে। তোমাকে আমি বাঁচাব। আমি যা বলছি শোন। তুমি এই শবটিকে যোগীর কাছে নিয়ে গেলে যোগী বলবেন তোমাকে, মহারাজ যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে দেবতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। যেই তুমি মাথা নীচু করে মাটিতে উপুড় হবে, অমনি সে তার খড়্গ দিয়ে তোমাকে বলি দেবে। তুমি তখন বলবে, আমি রাজাধিরাজ, কাউকে কোনদিন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নি। কিভাবে প্রণাম করতে হয় তাও জানি না, আমাকে শিখিয়ে দিন কিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয়। তা শুনে যেই তোমাকে সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করতে দেখাতে যাবে অমনি তুমি খড়্গ দিয়ে তার শিরোশ্ছেদন করবে। শবেস্থিত অশরীরী আত্মা, বেতাল এই বলে শব থেকে অদৃশ্য হয়ে চলে গেল।

বিক্রমাদিত্য বেতালবিহীন শবটিকে নিয়ে ধ্যানরত সন্ন্যাসীর কাছে এলে সন্ন্যাসী চোখ খুলে দেখলেন, বিক্রমাদিত্য তার অভিপ্রায় মত

কাজ করেছে। তিনি ভেবেছিলেন শবেস্থিত বেতালকেই বিক্রমাদিত্য এনেছে। তাই তিনি প্রথমে সেই শবকে বলি দিলেন, তারপর বিক্রমাদিত্যকে বললেন, তুমি এবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। বিক্রমাদিত্য বেতালের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী বললেন, তিনি তো রাজা, তাঁকে



কখনই কাউকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় নি, আর তাছাড়া কি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় তাও তিনি জানেন না। সন্ন্যাসীকে তিনি কিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় দেখিয়ে দিতে বললেন। সন্ন্যাসী রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার ভঙ্গিটি দেখিয়ে দিতে গেলে রাজা সেই সুযোগে খড়্গ দিয়ে তাঁর শিরোশ্ছেদন করলেন। দেবতারা এই দৃশ্য দেখে স্বর্গ থেকে বিক্রমাদিত্যকে আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন। বিক্রমাদিত্যের জয়গানে মুখরিত হল চরাচর।